দেওয়ানা

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

All Rights Reserved to the Author.

মূল্য—দেড় টাকা।

পৌষ ১৩২৬

রং মহল কাহিনী

তৃতীয়
সম্পূর্ণ
উপন্যাস

সিরিজ

দ্বিতীয় বৎসরের অপূর্ব্ব আয়োজন !!!

"দেওয়ানার" শেষে বিজ্ঞাপন দেখুন।

দ্বিতীয় বৎসরের চমকপ্রদ

প্রথম উপন্যাসের

আশা প্রতীক্ষায় থাকুন।

আগামী বৈশাখে (১৩২৭ সালে)

প্রকাশ হইবে।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস।

১২।১ নং চোরবাগান লেন, সিমলা, কলিকাতা

দেওয়ানা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আগরা সহরের এক রাজপ্রাসাদ তুল্য ভবনের কক্ষগুলি, আজ খুবই আলোকমালা সমুজ্জ্বল। এই প্রাসাদের অধিকারী, নবাব উল্‌মুলুক সুজা আলি বেগ। নবাব সুজা আলি বেগ, সম্রাট শাহজাহানের খাস মুকিম বা রত্নবণিক। অনেক টাকার মালিক তিনি। লোকে অনুমান করে, তিনি ক্রোরপতি। তাঁহার বাড়ী ঘরের সাজ সজ্জা, চাকর বাকর, বান্দা বাঁদীর সংখ্যাধিক্য ও যান বাহন দেখিলে, এই ঐশ্বর্য্যের কথা সত্য বলিয়াই বোধ হয়। "নবাব উল্‌ মুলুক" উপাধিটা সুজা আলি বেগের বংশগত। তিন পুরুষে তাঁহারা এই বাদশাহী উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পিতামহ আকবর শাহের অতি সংকট সময়ে, প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা তাঁহার সাহায্য করায়, তিনি সুজা আলির পিতামহকে "নবাব" উপাধি, জায়গীর ও শিরোপা দান করেন।

তাঁহার পিতা নিজাম আলি বেগ, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মুকিম বা বাদশাহী রত্নবণিক ছিলেন। এরূপ শোনা যায়, নুরজাহান বেগম তাঁহার বহুমূল্য রাজমুকুটের শোভা স্বরূপ অতি সমুজ্জ্বল যে হীরকখানি ব্যবহার করিতেন—তাহা এই মুকিম নিজাম আলির প্রদত্ত উপহার।

বৎসর দুই হইল নিজাম আলির দেহ কবরস্থ হইয়াছে। সুজা আলিই এখন তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি, কারবার ও উপাধির মালেক। বাদশাহের তিনি বড়ই পেয়ারের মুকিম।

এই উৎসবালোক সুজা আলির জন্ম দিনের। তাঁহার জননী এখন জীবিতা, সুতরাং তাঁহার স্বামীর আমল হইতে যে উৎসবটা চলিয়া আসিতেছে, সুজার জননী রুকিনা বেগম, তাহা বন্ধ না করিয়া পূর্ব্বের মত সবই বজায় রাখিয়াছিলেন। কেন না—এই সুজাই তাঁহার একমাত্র পুত্র।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নিকটস্থ আত্মীয় প্রতিবাসীগণই, এই উৎসব ব্যাপারে আমন্ত্রিত হইতেন। এই উৎসবের একটা বিশেষত্ব এই—খানা পিনা, আমোদ, আহ্লাদ, আদব আপ্যায়ন ছাড়া, প্রত্যেক সমাগত আত্মীয়কে, গৃহস্বামী এক একটী জহরত উপহার দিতেন। এই ব্যাপারটাই এই উৎসবের বৈচিত্র্যতা। হয়তঃ এই ব্যাপারে পঞ্চাশ ষাট ঘর আত্মীয় আমন্ত্রিত হইতেন। আর প্রত্যেক আমন্ত্রিত ব্যক্তিই—হয় একখানি নীলা, নয় পান্না, নয় পোখরাজ, নয় মোতি, না হয় হীরা, উপহার রূপে পাইতেন।

এ উপহার কাহারও অগ্রাহ্য করিবার যো ছিল না। কেন না -নিজাম আলির সময় হইতেই এই ভাবে উপহার দিবার প্রথা প্রচলিত। বাহাদুরীর মধ্যে এই—বিতরিত রত্নগুলির নামের ও বর্ণের পার্থক্য থাকিলেও, রতি হিসাবে তাহাদের ওজন আর মূল্য একই ছিল বলিয়া, আমন্ত্রিত বন্ধুগণের মধ্যে কাহারও মনঃক্ষোভ হইত না।

এইরূপ একটা উপহারের প্রথা প্রচলিত থাকায়, আত্মীয়েরা নিমন্ত্রণে আসিবার পূর্ব্বেই, নিমন্ত্রণকারী নবাব গৃহে নানারূপ সওগাত পাঠাইয়া দিতেন। মোটের উপর ইহা একটা কৌলিক প্রথা বই আর কিছু নয়। আর লোকেও জানিত—সরকারী রত্নবণিক এই আলি সুজা বেগের রত্ন ভাণ্ডারে অগণ্য মণি মুক্তা সঞ্চিত। তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহারা এরূপ দান করিতে কোন কষ্টই অনুভব করেন না।

রাত্রি দশটা বাজিবার পূর্ব্বে—বাড়ী প্রায় খালি হইয়া পড়িল। তখনও থাকিবার মধ্যে রহিলেন—দুই চারি জন আত্মীয়, যাঁহারা রক্তসম্পর্কে খুব অন্তরঙ্গ।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক সুরূপা যুবতীর দিকে আমাদের একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেন না, তাঁহার সঙ্গেই এই গল্পের সম্বন্ধ খুব বেশী।

এই নিমন্ত্রিতা নবীনা যুবতীর নাম আনারউন্নিসা। আনার পরমা রূপবতী। সুজা আলিবেগের বহু দিনের প্রতিবাসী। আর তাঁহার মাতা রুকিনা বেগমের সহিত এই যুবতীর পিতা

জামাল খাঁর কি একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। কাজেই উভয় পরিবারের মধ্যে মাখামাখি ভাবটা একটু জমাট ছিল।

সেই প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার একটী নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আনার উন্নিসা ও সুজা আলি বেগ নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছিলেন।

কক্ষটী সুগন্ধি দীপে আলোকিত। দীপের তীব্র আলোক-ছটা সুরূপা আনারের মুখের উপর পড়িয়াছে। তাহার সাঁচ্চা কাজ করা ফিরোজা রঙ্গের সুন্দর ওড়না খানির উপর দীপচ্ছটা পড়ায় স্বভাব সুন্দরী এই আনারকে যে সৌন্দর্য্য দিয়া সাজাইয়াছেন, তাহা যেন আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

সুজা বেগ সহাস্য মুখে বলিল—"আনার উন্নিসা! আজ তোমাদের অনর্থক কষ্ট দিলাম।"

আনার সহাস্য মুখে বলিল—"এত আপ্যায়ন ও যত্নে যদি কষ্ট হয়, এত তরিবতী খাওয়া দাওয়ানতে যদি অসুখের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সুজা সাহেব! এরূপ কষ্ট আমি কেন—অনেকেই স্বেচ্ছায় উপভোগ করিতে চাহিবে। যাক্—আজ আমরা বিদায় হই। আমার পিতা বোধ হয় রাত বেশী হইতেছে দেখিয়া, একটু উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। কারণ সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করাই তাঁর নিয়ম।"

সুজা বেগ একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"হয়তো তাই! যাই হক আনার! এতক্ষণ যখন অপেক্ষা করিয়াছ, তখন আরও একটু অপেক্ষা কর।"

আনারের কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, সুজা বেগ তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মখমলমণ্ডিত কারুকার্য্যময় একটী সুন্দর বাক্স আনিয়া, তাহার উপরের ডালাটী খুলিয়া স্মিতমুখে আনারের সম্মুখে ধরিলেন।

কক্ষ মধ্যস্থ দীপাবলির উজ্জ্বল আলো সেই বাক্সের ভিতরের জিনিসটীর উপর পড়ায়. সেটা আরও চকচক্ করিতে লাগিল। আনার সবিস্ময়ে বলিল—"বা! বেশ সুন্দর জড়োয়া হার ত? আমার বোধ হয় এর হীরাগুলি খুবই দামী।"

সুজাবেগ সহাস্য মুখে বলিলেন—"এই হারের মূল্য দশ হাজার টাকা।"

"দ—শ—হা—জা—র—টা—কা!!" এই বলিয়া বিস্মিত নেত্রে সেই হার ছড়াটী তুলিয়া লইয়া তাহা দুই একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, একটা তৃপ্তির সহিত আনার বলিল—"বেশ কিস্মতিয়া হার ছড়াটী ত! যে পরবে, সে যদি খুব সুন্দরী হয়, তাহা হইলে এই হার ছড়াটী তাহাকে বড়ই মানাইবে।"

সুজা আলি বেগ রহস্য করিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন— "আচ্ছা সে যদি তোমার মত অতুলনীয়া রূপসী হয়, তবে এই হারের জ্যোতিঃ হয় তো তাহার উজ্জ্বল রূপের কাছে খুবই মলিন হইয়া পড়িবে।"

আত্মরূপের এইরূপ প্রশংসায় আনারের সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সে—এ মন্তব্যের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল

না। কেবল মাত্র—একটু মৃদু হাসিয়া সুজা বেগের কথায় একটা নীরব উত্তর দিল মাত্র।

হার ছড়াটী সুজা বেগের হাতে দিয়া আনার বলিল, "তাহা হইলে আজ বিদায় দিন; রাত অনেক হইয়াছে।"

সুজা বেগ হাস্য মুখে বলিলেন—"তোমাকে আর দেরী করিতে বলিতে পারি না। কিন্তু আনার! যাইবার পূর্ব্বে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

আনার প্রফুল্ল মুখে বলিল—'কি অনুরোধ নবাবজাদা? এক পেয়ালা আঙ্গুরের মিঠি সরবৎ?"

সুজাবেগ বলিল—"সেটা ত বিদায়ী অভিবাদন! আমার অতি স্পৃহনীয় অনুরোধ হইতেছে এই—যে এই হার ছড়াটী আমি তোমাকে পরাইয়া দিব।"

হাস্যমুখী আনারের মুখ খানা এই কথা শুনিয়া, সহসা যেন মেঘ ঢাকা চাঁদের মত মলিন হইয়া গেল। কিন্তু সে তখনঃ সপ্রতিভ ভাবে বলিল—"আমি এ রত্নহারের যোগ্যা নই ত নবাব সাহেব! আর ইহা গ্রহণ করিবার কোন দাবিই—বোধ হয় আমার নাই নবাবজাদা!"

সহসা এই সময়ে এক প্রৌঢ়া রমণী, সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আছে বই কি মা! তোমার খুবই অধিকার আছে; এ হারটী আমি তোমাকে আমার সুজার জন্মদিনের উপহার রূপে দিব বলিয়া, নিজেই নির্ব্বাচিত করিয়াছি। ইহা তোমাকে লইতেই হইবে। নচেৎ আমি খুবই দুঃখিত হইব।"

এই প্রৌঢ়া রমণী রুকিনা বেগম। সুজা আলির গর্ভধারিণী।

কথাটা বলিবার সময রুকিনা বিবির মুখে এমন একটা নির্ব্বন্ধের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল—যাহা সুচতুরা আনার অতি সহজেই পড়িয়া লইল। এতটা স্নেহ মিশ্রিত স্বরে, রুকিনা বিবি এ কথাগুলি বলিয়াছিলেন—যে আনার উন্নিসা তাহার কোন প্রতিবাদই করিতে পারিল না। তবুও সে অতি কোমল স্বরে বলিল—"আমি কি এ বহুমূল্য হারের যোগ্য মা!"

রুকিনা সহাস্য মুখে বলিলেন—"তুমি এই অপূর্ব্ব উপহারের যোগ্যা কি না, সে কথা বিচার করিবার তুমি কে আনার উন্নিসা? আমার ইচ্ছা হইয়াছিল—কাজেই আমি বহুমূল্য রত্ন-হার ছড়াটী তোমার জন্য বাছিয়া রাখিয়া আমার সুজার নিকট দিয়াছিলাম। আজ তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমার বাটীতে আসিয়াছ—কিন্তু সত্য বলিতে কি, তোমার রূপের জ্যোতিঃতে আমার ঘর যেন আলো হইয়া উঠিয়াছে। আরও ত অনেক সুন্দরী রূপসী আসিয়াছিল—আনার উন্নিসা! কিন্তু তোমার মত এমন অতুলনীয় রূপসী ত তাদের মধ্যে কেহই ছিল না। আমি তোমার মা! মায়ের দান গ্রহণ কর। এ দান—এ স্মৃতি চিহ্ন—সুজার প্রদত্ত নয়—আমারই স্নেহের উপহার।"

এতটা সরল ভাবে, প্রাণের উচ্ছ্বাসের সহিত রুকিনা বিবি এই কথা গুলি বলিলেন—যে আনার উন্নিসা তখনই তাঁহার নিকটে অবনত মস্তকে দাঁড়াইল। আর রুকিনা বেগম সেই বহুমূল্য হারছড়াটী আনারের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন,

"তোমার পিতা পার্শ্বের কক্ষে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এখন তুমি যাইতে পার।"

রুকিনা বেগম, আনারের চিবুকখানি ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"যদি আমার সুজার বৌ করিতে হয়, তোমার মতই সুন্দরী বৌ করিব।" এই কথা বলিয়া হাসিভরা মুখে—রুকিনা বিবি, অপর কক্ষ মধ্যেস্থিত তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়াদের নিকট চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য—সুজা বেগ্ আনারকে তাহার পিতার নিকট পৌছাইয়া দিলেন। এমন কি দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহাকে ও তাহার পিতাকে আপ্যায়িত করিয়া, গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

আনারের পিতা--দেখিলেন চিরদর্পিত, ঐশ্বর্য্যাভিমানী নূতন নবাব এবার যেন তাঁহাকে একটু বেশী খাতির যত্ন দেখাইতেছেন। আরও দুই তিনবার তিনি এই নবাব পরিবারের এই প্রকার বাৎসরিক নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। খাতির যত্ন হইয়াছিল খুব। কিন্তু এবার যেন—আপ্যায়নের মাত্রাটী ষোলোর উপর আঠারো আনায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

বলা বাহুল্য—আনার তাহার কণ্ঠের সেই রত্নহার ছড়াটী তাহার ওড়না দিয়া ঢাকিয়া ফেলাতেই, আনারের পিতা জামাল খাঁ, এ রত্নহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। জানিলে বোধ হয় তিনিও তাঁর কন্যাব ন্যায় আরও বিস্মিত হইতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই হার ছড়াটী যার দাম দশ হাজার টাকা, আর যাহা সুজা বেগের জন্মতিথির উপহার রূপে আনারউন্নিসা স্বপ্নে প্রাপ্ত দুর্ল্লভ রত্নের মত লাভ করিয়াছিল, তাহা সংসার জ্ঞান অনভিজ্ঞা সরলা আনারের মনে, আনন্দের পরিবর্ত্তে কতকগুলা দুশ্চিন্তার সঞ্চার করিয়া দিল। কেন তাহা সেই বলিতে পারে।

তাহাদের অবস্থা তখন তত ভাল নয়। এখন অবশ্য তাহারা ভাগ্য পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও এক সময়ে তাহাদের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল। অবশ্য সুজা বেগের ঐশ্বর্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত, তাহার পৈত্রিক ঐশ্বর্য্য ছিল না বটে, কিন্তু যাহা ছিল—তাহা তাহার কতকটা কাছাকাছি ছিল বটে।

অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণ, এই নবাব সুজাবেগের কৌলিক প্রথামত এ বারেও এক একটী রত্নাঙ্গুরীয় লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বেলায় কেন যে এই রাজরাণির ভোগ্য, বহুমূল্য রত্নহারের ব্যবস্থা হইল, তাহা অনেক দিক দিয়া ভাবিয়াও আনার উন্নিসা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

পূর্ব্বরাত্রে তাহার পিতাকে সে এই বহুমূল্য রত্নহারের কথা কিছুই বলে নাই। কেন—তাহা সেই জানে। কিন্তু সমস্ত রজনী ব্যাপী চিন্তার পর সে বুঝিয়াছে, এ সংবাদটী তাহার পিতাকে জানানো—খুবই প্রয়োজন।

প্রভাতে উঠিয়া সে সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে তাহার পিতা আসিয়া তাহার কক্ষে দেখা দিলেন।

আনারকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার পিতা বলিলেন—"তোমার মুখ অত শুখ্‌নো কেন মা? তোমার কাল রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় নাই?"

আনারউন্নিসা একটু মলিন হাস্যের সহিত বলিল—"সত্যই বাবা তাই! কাল আমার নিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত হইয়াছিল।"

"কেন?"

"এক রত্নহারের জন্য?"

"রত্নহারের জন্য! আমাদের বাড়ীতে এক সময়ে রত্নহার দু দশ ছ'ড়া ছিল বটে! তখন ভাবনাও ছিল বটে। কিন্তু এখন ত সে গুলি নাই! তবে কি তুমি স্বপ্নে রত্নহার দেখিলে নাকি?

"স্বপ্ন নয় বাবা! প্রত্যক্ষ সত্য! সে রত্নহার আপনাকে এখনই আনিয়া দেখাইতেছি!"

"আগে বল—কোথায় পাইলে তুমি সেই হার?"

"নবাব সুজা খাঁ দিয়াছেন।"

"তোমাকে?"

"হাঁ—আমাকে?"

কথাটা শুনিয়া বয়োবৃদ্ধ জামাল খাঁ, ভ্রুকুটী ভঙ্গী করিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন—"কারণ?"

আনারউন্নিসা গম্ভীর মুখে বলিল "কারণ—কিছুই জানি

না। তবে সুজার জননী রুকিনা বিবি বলিলেন—আমার পুত্রের জন্মোৎসবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, তিনি আমায় এই বহুমূল্য উপহার দিয়াছেন।"

জামাল খাঁ—বিস্মিত চিত্তে বলিলেন—"কোথায় সে রত্নহার?"

আনার উন্নিসা তাহার পেটিকা মধ্য হইতে সেই হার বাহির করিয়া, তাহার পিতার সম্মুখে ধরিল।

রত্ন বিচারে বৃদ্ধ জামাল খাঁর একটা পূর্ব্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি দুই চারি বার সেই হার ছড়াটী নাড়াচাড়া করিবার পর বুঝিলেন—সত্যই সে হারের খুব কিম্মত আছে।

কন্যার মত, জামাল খাঁও এই বহুমূল্য উপহারের ভিতরের রহস্যটী বুঝিতে না পারিয়া, একটু চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সে চিন্তা চাপিয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন—"ভালই হইয়াছে! কখন যে কাহার উপর খোদার সুনজর পড়ে, তাহা বোঝা বড়ই কঠিন! তাহা না হইলে, অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা যে উৎসব স্থলে একটী করিয়া অঙ্গুরীয় উপহার পাইয়াছে, সে স্থলে তোমার সম্বন্ধেই বা এরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ঘটিল কেন? এ দান অবশ্য রুকিনা বিবির হাত দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত দাতা—সেই মহিমময় বিধাতা।"

আনার, স্থিরচিত্তে তাহার পিতার এই কথাগুলি শুনিল। সেও তাহার পিতার মত এই রত্নহারের কথাই তখন মনেমনে আলোচনা করিতেছিল। আনার তাহার পিতাকে সহসা সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিল—"বাবা!

আমি একটা কথা মনে মনে এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম। যদি কন্যার বেয়াদবী বলিয়া না ভাবেন, তাহা হইলে সেটি আপনাকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। মা—মরিবার পর হইতে কোন কথাই আমি আপনার কাছে গোপন করি না। মনে যখন যা উদয় হয়, আপনাকেই বলি।"

কন্যার মুখে এইরূপ লম্বা ভূমিকা শুনিয়া, বৃদ্ধ জামাল খাঁ তাঁহার হেনারঞ্জিত পীতবর্ণের পক্ক শ্মশ্রু রাজির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া—তাহা চিন্তাপূর্ণ ভাবে মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলিলেন—"কি কথা তুমি আমাকে বলিতে চাও আনার? তোমার স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুর পর হইতে, আমার নিকট তোমার মনোভাব প্রকাশ করার সম্বন্ধে আমি যে তোমায় পূর্ণ স্বাধীনতাই দিয়াছি। কখনও ত তোমার এ অধিকারের সংকোচ করি নাই- ও ভবিষ্যতেও করিবও না।"

পিতার কথায় একটু সাহস পাইয়া, আনার উন্নিসা মেঝের দিকে তাহার দৃষ্টিসংযত করিয়া বলিল—"আমি বলি কি,এই হার নবাবজাদাকে ফিরাইয়া দিই। যে রত্নহার আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আপনার ও আমার মনে দারুণ দুশ্চিন্তা সঞ্চার করাইয়া দিয়াছে, তাহা আলোয় আলোয় বিদায় করাই ভাল।"

জামাল খাঁ কন্যার কথা শুনিয়া, একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"ছিঃ! ও কাজ করিতে আছে মা! ইহাতে ককিনা বিবির মনে খুবই একটা কষ্ট বোধ হইবে। থালি কষ্ট নয় আনারউন্নিসা, তিনি ইহাতে নিশ্চয়ই অপমানিতা বোধ

করিবেন। তার চেয়ে এক কাজ কর তুমি। চিরদিন অবশ্য আমাদের এ অবস্থা থাকিবে না। একদিন এর পর যদি ভাল অবস্থা আসে, তখন এইরূপ একটা কিস্মতিয়া উপহার নবাব সুজা বেগকে পাঠাইয়া দিলেই, হয়ত আমার ও তোমার মনটা এ রহস্যময় দানের সম্বন্ধে খুবই হাল্‌কা হইয়া যাইবে।"

জামাল খাঁ আর কিছু না বলিয়া, সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সেই কক্ষ মধ্যে রহিল কেবল আনারউন্নিসা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আনার উন্নিসার এক পেয়ারের বাঁদী ছিল। সে যুবতী, সদা প্রফুল্লমুখী ও আনারের সমবয়সী। আবাল্য তাহার সহিত একত্রে প্রতিপালিতা, তাহার সুখে দুখে সমবেদনা পরিপূর্ণা। তাহার নাম জুমেলি।

জামাল খাঁ কক্ষ ত্যাগ করিলে, জুমেলি হাস্যমুখে সেই মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনারের হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিল— "আবার বোধ হয় নবাব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ! আবার বোধ হয় আর একছড়া রত্নহার।"

এই জুমেলি, আনারের সঙ্গে এক কক্ষে এক শয্যায় শয়ন করিত। জুমেলির মা—আনারের বাল্যকালের দাই। এজন্য মার মৃত্যুর পর জুমেলি এ সংসারের একরূপ কর্ত্রী হইয়া

উঠিয়াছে। আনারউন্নিসা তাহার সঙ্গিনী ও সখী। এই জুমেলাকে ষোল ছাপাইয়া বোধ হয় আঠারো আনা বিশ্বাস এই আনারউন্নিসা করিত।

আনার উন্নিসা জুমেলিয়ার এই রহস্যময় কথায় একটু কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিল,—"আ মর্! ছুঁড়ি রঙ্গ রাখ্! কার—এ পত্র? কে তোকে এ পত্র দিল?"

জুমেল গালি খাইয়া হঠিল না। বলিল—"নসীব তোমাকে যে খানে একদিন টানিয়া লইয়া গিয়া, রাণীর সিংহাসনে বসাইবে,—এ পত্রখানি হয়ত সেখান হইতেই আসিয়াছে।"

আনার উন্নিসা জুমেলির দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল "হেঁয়ালি ছাড়িয়া দে। সোজা কথায় বল্—কোথায় এ পত্র পাইলি?"

জুমেলি এবার বলিল—"সুজাবেগের খাস বাঁদী এ পত্র আনিয়াছে। পড়িয়াই দেখনা কেন। সব জানিতে পারিবে।"

একটু বিস্মিতভাবে আনার সেই পত্রখানি খুলিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—"আনার উন্নিসা! এ জগতে মানুষের সকল কামনা তো পূর্ণ হয় না। বিধাতা আমায় প্রচুর ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন—সমাজে যথেষ্ট সম্মান দিয়াছেন। বন্ধু বান্ধবেরও আমার কোন অভাব নাই। রাজ-দরবারেও আমার খুব খাতির। এক অভাবে কিন্তু আমার সকল সুখ নষ্ট হইতেছে। আমি চাই তোমার মত এক রূপবতী, গুণবতী সহধর্ম্মিণী। আমার মাতাও তোমাকে তাঁহার পুত্র বধূ রূপে গ্রহণ করিতে খুবই উৎসুক।

আমার বহু দিনের সুখস্বপ্ন এই, যে তুমি আমার অঙ্ক লক্ষ্মী হইবে। বড়ই সাধে ভরা, আশায় মোড়া, এই সোনার স্বপনটী আমার। এ স্বপন তুমি চূর্ণ করিয়া দিও না। তোমার সম্মতি পাইলে প্রত্যক্ষভাবে তোমার পিতার নিকট তোমার হস্ত প্রার্থনা করিব। এই পত্রের অনুকূল উত্তর আমার হাতে আসিলে আমার মাতা নিজে তোমাদের বাড়ীতে গিয়া সমস্ত কথা ঠিক করিয়া আসিবেন।—"সুজাবেগ।"

জুমেলি অনুমানে কতকটা বুঝিয়াছিল, নবাব সুজা বেগের এই পত্রে সম্ভবতঃ কি লেখা থাকিতে পারে।

আর সে একথাও ভাবিতেছিল, হয়ত পত্রখানা পড়িয়া আনারের মুখটা খুবই প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে; কেন না, সে কাণাঘুষায় একটা খবর শুনিয়াছিল, যে সুজাবেগের মাতা রুকিনা বিবি আনারকে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী করিতে খুবই উৎসুক।

নবাব সুজা বেগের অতুল ঐশ্বর্য্য। দেখিতেও তিনি কান্তিময়। মোগল রাজসরকারে তাহার খুবই প্রতিপত্তি। এই সুজা বেগের পত্নী হইলে, আনার রাজরাণীর মত আদরে থাকিবে, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে, তাহার নারী জন্মের সকল সাধ মিটিবে, এইরূপ সুখস্বপ্ন এক এক সময়ে তাহার অবসন্ন মনটাকে খুবই আলোকময় করিয়া তুলিত।

পূর্ব্বরাত্রে সুজা বেগ আনারকে যে বহুমূল্য কণ্ঠহার উপহার দিয়াছিলেন, তাহা যে এই মিলনের পূর্ব্বরাগ—সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আনারের হস্ত প্রার্থনার প্রথম অভিজ্ঞান, তাহাও সে ধরিয়া

লইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল, যে তাহার প্রিয় সখীর মুখখানা সুজা বেগের পত্র পড়িয়া হর্ষোৎফুল্ল না হইয়া, খুবই মলিন হই য়া গেল—তখন সে বড়ই ভাবিত হইল।

জুমেলি কিয়ৎক্ষণ তাহার সখীর মুখের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিয়া, সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল—"তোমার মুখখানা অত মলিন হইয়া গেল কেন? তাহা হইলে পত্রে কি কোন দুঃসংবাদ আছে না কি?"

আনার বলিল—"অন্ততঃ অন্যের পক্ষে দুঃসংবাদ না হইতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে এই চিঠি খানা খুবই কুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। পত্রখানা পড়িয়া দেখ না তুমি জুমেলি! তাহা হইলেই হয়ত সব কথা বুঝিতে পারিবে।"

জুমেলী পত্রখানি পড়িয়া বুঝিল—তাহাতে এমন কোন সাং-ঘাতিক বা অশুভ ঘটনার সংবাদ নাই, যাহা পড়িয়া আনারের মুখখানা মলিন হইয়া পড়িতে পারে। কিংবা একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া, তাহার হৃদয়কে অন্ধকারময় করিয়া দিতে পারে।

পত্রখানি পড়িয়া ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া, জুমেলি কেবল মাত্র বলিল,—"বিবাহ হইলে পিতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে দূরে যাইতে হইবে, সেই জন্যই বোধ হয় তোমার মনটা খুবই চঞ্চল হইয়াছে। এ বিষয়ের সম্বন্ধে চুড়ান্ত মীমাংসা তোমার পিতার হাতে। তিনি যে হুকুম করিবেন, তাহা তোমাকে নিশ্চয়ই মানিয়া চলিতে হইবে।" আর বেশী কিছু না বলিয়া জুমেলি অন্য কাজে চলিয়া গেল।

আনার উন্নিসা বিষণ্ণমুখে তাহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা জামাল খঁা তখন ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র লইয়া খুবই অভিনিবিষ্ট চিত্ত।

জামাল খাঁ, কন্যাকে মলিন মুখে তাঁহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন,—"একি! তোমার মুখখানা অত শুক্‌নো কেন আনারউন্নিসা? কোন অসুখ করেছে কি তোমার?"

আনার প্রথমে নিজের ভিতরের চঞ্চল অবস্থাটা গোপন করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহা বোধ হয় পারিল না। তাহার প্রাণের মধ্যে যে একটা প্রবল ঝটিকা উঠিতেছিল, তাহা পিতার সহিত সাক্ষাতে যেন একটু বেশী জোর সঞ্চয় করিল। আর এটুকুও সে ভাবিল, হয়ত সে ধরা পড়িয়াছে। তবুও তাহার সেই অবস্থাটা সাধ্যমত গোপন করিবার জন্য, সে তাহার পিতার হাতে সুজা বেগের সেই পত্রখানি দিল।

জামাল খাঁ, মুহূর্ত্ত মধ্যে পত্রখানি পড়িয়া লইয়া, চিন্তিত মুখে বলিলেন—"আমিও এই মাত্র নবাব সুজাবেগের নিকট হইতে আর একখানা পত্র পাইয়া বুঝিতেছি, তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য, সে খুবই ব্যগ্র। তোমায় লিখিয়াছে, যে তোমার সম্মতি পাইলে সে পরে আমার অভিমত প্রার্থনা করিবে' কিন্তু সে বিলম্বটুকুও বোধ হয় সহ্য করিতে না পারিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও এক পত্র লিখিয়াছে। এখন করা যায় কি আনার?

এ ভাবে তাহার নিকট সম্মতি প্রার্থনা করায়, পিতার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আনারউন্নিসা বলিল, আপনি পিতা, আমি কন্যা। মা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে, অবশ্য এ বিষয়ে প্রকৃত পরামর্শ দিবার লোকের অভাব বোধ হয় আপনাকে ভোগ করিতে হইত না। আপনি আমাকে যে পাত্রে সমর্পণ করিবেন, তাঁহাকে আমি সমাজ ও ধর্ম্ম মতে স্বামীরূপে গ্রহণ করিব। কিন্তু—"

জামাল খাঁ বিস্ফারিত লোচনে আনারউন্নিসার মুখের দিকে চাহিয়া উৎসাহিত ভাবে বলিলেন,—"বল—বল—কি বলিতে-ছিলে? "কিন্তু" বলিয়া থামিয়া গেলে কেন মা?"

পিতার এই কথায় সাহস পাইয়া, আনার দৃঢ়স্বরে বলিল,—"কিন্তু বাবা! মীর লতিফের কথাটা এত শীঘ্র ভুলিলেন কি করিয়া? যে তাহার বহুমূল্য শোণিতধারা দান করিয়া, একদিন আপনার জীবনাশা-বিহীন রুগ্ন কন্যাকে বাচাইয়াছিল, যে একদিন আপনার জলনিমজ্জিতা কন্যাকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া জীবনের সীমায় ফিরাইয়া আনিয়া দিয়াছিল,—যাহার কৃতপোকারে বাধ্য হইয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে আপনি যাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"এই আনারের উপর তোমার ষোল আনা অধিকার—কেন না দুই দুইবার তুমি এর জীবন বাঁচাইয়াছ।" আজ তাহার হাত হইতে সে অধিকার কাড়িয়া লইবেন কিরূপে পিতা? যে মীর-লতিফ্‌কে আপনি বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন, যে আপনার সন্তান তুল্য, তাহাকে ত্যাগ করিবেন কিরূপে?"

কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। একবার এই আনার উন্নিসার অতি কঠিন পীড়া হইয়াছিল। তাহার শরীরে তিলমাত্র রক্তকণা ছিল না। হকিম যখন বলিলেন,—"অন্য সুস্থদেহ হইতে শোণিত লইয়া এই রোগীর দেহে প্রবেশ না করাইলে এ বাঁচিবে না,—তখন এই মীর লতিফই যে প্রফুল্লমুখে, নির্ভীক হৃদয়ে, তাহার দক্ষিণ বাহু খানি প্রসারিত করিয়া দিয়া আসন্ন মৃত্যুকবলগত আনারের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। আর ইহার অনেক পূর্ব্বে একদিন স্থানান্তরে কোন আত্মীয়গৃহে নিমন্ত্রণ যাইবার সময়ে, সহসা ঝড় উঠায় যমুনার স্রোত যখন নৌকা উল্‌টাইয়া দিয়াছিল, তখন এই মীর লতিফই নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আনারকে বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়া, নদীর পর পারে পৌঁছিয়া দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করে। অথচ তিনি পিতা হইয়াও আনারকে ত্যাগ করিয়া নিজের বিপন্ন জীবন রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর এই ভীষণ ঘটনার ফলে এই লতিফ্‌ যখন একমাস কাল কঠিন রোগে শয্যায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তখন তিনি নিজে ও তাঁহার কন্যা আনার উন্নিসা, দিন রাত খাটিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া, কত কষ্টে এই রোগীকে বাঁচান, তাঁহাও তাহার চোখের সম্মুখে যেন পূর্ব্ব দিবসের কোন ঘটনার মত ফুটিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া, জামাল খাঁ তাঁহার কন্যা আনার উন্নিসাকে বলিলেন, "ভাল তোমার ও আমার পত্রের উত্তর আমিই দিব। এই বিবাহ প্রস্তাবের একটা সূক্ষ্ম মীমাংসার

জন্য কিছুদিন সময় প্রার্থনা করিয়া আমিই আজ্‌কে সুজাবেগকে পত্র লিখিতেছি।”

পিতার কথায় আনার উন্নিসার প্রাণটা যেন খুব হাল্‌কা হইয়া গেল। নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, একটা অপরিমেয় আনন্দে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—“খোদা! বিশ্ব-পাতা! তোমার অপার মহিমা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক প্রভু!”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে কে যেন তাহার এই কথা গুলি লুফিয়া লইয়া প্রত্যেক কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল,—“সত্যই সেই মঙ্গলময় বিধাতার অপার মহিমা। আমিও বলি, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!”

আনার সম্মুখে চাহিবা মাত্রই দেখিল, মীর লতিফ্‌ তাহার কক্ষদ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া।

আনার প্রফুল্লমুখে বলিল,—“এস মীর সাহেব! পরের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন? আমরা আজকাল একটু গরীব হইয়াছি বলিয়া নাকি?”

লতিফ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, “আমি যে তোমাদের চেয়েও গরীব—আনার উন্নিসা!”

আনার বলিল,—"তাহা হইলেও তোমার উপর বিধাতার অনুগ্রহ আমাদের চেয়েও বেশী!"

লতিফ। সত্যই তাই!

আনার। আচ্ছা,—কিসে বুঝিলে?

লতিফ। বুঝিলাম—অনেক কারণে। প্রথম,—আজ "একশতী মন্সবদারের" নিয়োগ পত্র দরবারে পাইয়াছি। বুঝিলাম, বিধাতা আমায় খুবই কৃপা করেন, কেননা তোমরাও যথেষ্ট ভালবাস। যার এ সংসারে আপনার বলিবার কেহ নাই,—অথচ যাকে তোমরা এত আপনার বলিয়া বোধ কর—স্নেহ কর—আদর কর,—তার চেয়ে ভাগ্যবান্ কে আছে আনারউন্নিসা?"

আনার। কই তোমার মন্সবদারীর পরোয়ানা খানা একবার দেখাও দেখি।

লতিফ—ত্র্যস্ত-ব্যস্তে তাহার উষ্ণীষমধ্য হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, আনারের হাতে দিয়া বলিল,—"পড়িয়া দেখ। ইহাতে কি লেখা আছে।"

সুরূপসী আনার উন্নিসা তাহার পিতার নিকট সে সময়ের প্রথামত, প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিল। সুতরাং মীর লতিফের মন্সবদারী পরোয়ানা খানির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাহার কষ্ট বোধ হইল না। বরঞ্চ সেখানি পড়িয়া সে খুবই একটা আনন্দ বোধ করিয়া বলিল,—"খোদা তোমার মঙ্গল করুন লতিফ্! তোমাকে আরও বড় করুন।"

লতিফ বলিল,—"তোমার অন্তরের এই প্রার্থনা নিশ্চয়ই

বিফল হইবে না। বাল্যকাল হইতে আমরা দুইজনে একত্রে মানুষ হইয়াছি। এক পিতৃমাতৃহীন অনাথ আমি। তোমার স্বর্গগত জননী না থাকিলে, স্নেহবশে নিজের সন্তান বলিয়া আমাকে তাঁহার বুকে টানিয়া না লইলে, এই নির্ম্মম স্বার্থপর সহানুভূতিহীন দুনিয়ার প্রচণ্ড স্রোতে যে কোন অজানা রাজ্যে আমার মত হতভাগা চলিয়া যাইত, তাহাও জানি না।"

আনার, লতিফের মুখ চাপিয়া ধরিয়া সহাস্যমুখে বলিল,—"চুপ কর লতিফ,—চুপ কর! ও পুরাণো কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। নূতন আর কিছু বলিবার থাকে ত বল।

লতিফ্ অগত্যা থামিয়া গেল। আনার উন্নিসা লতিফকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়া বলিল.—"কিছু খাইবে কি? আঙ্গুরের সরবৎ আনিব?"

লতিফ বলিল.—"সরবৎ বা খাবার তোমাদের কোন্ ঘরে থাকে তাও আমি জানি, আর তোমাদের সংসারের কর্ত্রী জুমেলিও আমার অপরিচিত নয়। দরকার হইলে আমি নিজেই গিয়া খাইতে পারিব।"

আনার বলিল,– তা'ত পারই! তবে নূতন মন্সবদারের সম্মান চিহ্ন স্বরূপ আজ আমারিই এই সরবৎটা বহিয়া আনা দরকার।"

আনার উঠিতে যাইতেছিল। লতিফ তাহার হাত ধরিয়া বসাইল। বলিল,—"আর একটা কথা আমার বলিবার আছে। সেটা শুনিলে বোধ হয় সুখী হইবে না।"

আনার। এমন কি কথা ?

লতিফ। নূতন মন্সবদার হইয়াছি। এজন্য বোধ হয়, আমাকে শীঘ্রই রাজকুমার দারার সহিত আজমীরে যাইতে হইবে। এইরূপ একটা জনরব ত আজ শুনিয়া আসিলাম। এটাকে একেবারে অবিশ্বাস করিতেও পারি না। কেননা—যাঁহার মুখে কথাটা শুনিলাম, তিনি আমার উপরওয়ালা কর্ম্মচারী।

আনার। তাহা হইলে উপায় ?

লতিফ। সহজে কি তোমাদের ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে পারিব ? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, যাহাতে এ ব্যবস্থা নাকচ্ করাইতে পারি। আর চেষ্টা করিলে যে কৃতকার্য্য হইব না, তাহারও সম্ভাবনা নাই।

আনার উন্নিসা একটা তৃপ্তির সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই ভাল ! তা তুমি আমাকে তোমার পরোয়ানা খানা তো পড়াইয়া লইলে,—এবার আমি তোমাকে আমার একখানা পরোয়ানা পড়িতে দিব।"

এই কথা বলিয়া, আনার সুজাবেগের সেই পত্রখানি মীর লতিফের হাতে দিল। সাগ্রহে পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর মীর লতিফ শুষ্ক মুখে বলিল,—"এ পত্রের কি উত্তর দিয়াছ তুমি ?"

আনার। একটা দিয়াছি বই কি।

লতিফ। কি লিখিলে ?

আনার। লিখিয়াছি—যখন, নারীরূপে দুনিয়ায় জন্মিয়াছি,

তখন স্বামী ত আমার একজন চাই। আপনার মত আমার লোক যদি আমাকে পত্নী-বলিয়া দয়া করিয়া গ্রহণ করেন,—সেটা আমার সৌভাগ্য বই আর কিছুই নয়।"

মীর লতিফ এই কথাটা শুনিয়া খুবই দমিয়া পড়িল। শুষ্ক মুখে, কম্পিত হৃদয়ে বলিল,—"সত্যই তাই লিখিয়াছ নাকি? বল কি—আনার উন্নিসা?"

আনার, তাহার মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল,—"সত্য নয় তো কি মিথ্যা বলিতেছি। এ সব সাংঘাতিক ব্যাপারে কি রহস্য চলে লতিফ?"

মীর লতিফ ম্লানমুখে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"একবারও আমার মুখের দিকে চাহিলে না আনার উন্নিসা! আমার যে সব গেল! ইহজীবনের আশা, উৎসাহ, অস্তিত্ব, সবই যে তুমি আমার!

লতিফ আর বলিতে পারিল না। মর্ম্মবেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর ভারি হইল। প্রাণের ভিতর তাহার যে একটা যাতনা হইতেছিল,—তাহা অশ্রুধারা রূপে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল।

আনার, মীর লতিফের এ অবস্থা সহ্য করিতে পারিল না। সে এতক্ষণ লতিফের সহিত একটু রহস্য করিতেছিল মাত্র। কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই, যে এই ব্যাপারে লতিফের চোখ দিয়া জল বাহির হইবে।

আনার তাহার ওড়নার এক প্রান্ত দিয়া লতিফের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"তোমার সহিত একটু রহস্য

করিতেছিলাম মাত্র লতিফ্ ! এ সোজা কথাটাও তুমি আমার কথার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলে না ? তাজ্জব বটে !"

লতিফ—মৃদু হাসিয়া বলিল,—"হাঁ রহস্যের সময়ই এই বটে ! ব্যাধ যেমন মৃগের উপর শর নিক্ষেপ করিয়া রহস্য করে, তোমার রহস্যটা অনেকটি সেই ধরণের।"

আনার উন্নিসা মীর লতিফের চিবুক ধরিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল,—"এতেই তুমি এতটা কাতর, কিন্তু আমি যদি মরিয়া যাই মীর লতিফ্ ?"

লতিফ এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, বিধাতার ইচ্ছা যদি তাই হয়, তাহা হইলে আমিও জানি কি উপায়ে তোমার সহিত মরণের পরেও মিলিত হইবে। যাক, আনার, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নবাবজাদার এ প ত্রের উত্তর তুমি দাও নাই এটা ঠিক ?"

আনার। নিশ্চয়ই।

লতিফ। কি উত্তর দিবে ?

আনার। আমার পিতা যখন বর্ত্তমান, তখন এ পত্রের উত্তর দিবার কোন অধিকারই আমার নাই। কোন স্বাধীনতাই আমার নাই। এ পত্রের যাহা সঙ্গত উত্তর, তাহা আমার পিতাই দিবেন। তবে এ ভাবে একটা অতিরিক্ত স্বাধীনতা লইয়া আ মাকে স্বতন্ত্র ভাবে পত্র লেখাই, সুজা বেগের খুব অন্যায় কাজ হইয়াছে।"

আনারের এই কথা শুনিয়া লতিফের প্রাণের ভিতর হইতে

যেন একটা পাষাণের ভার নামিয়া গেল। তাহার জীবনের আশার উজ্জ্বল আলোকটি নিরাশার প্রমত্ত বায়ুতে নিবিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। খুব একটা জমাট অন্ধকার তাহার চোখের সম্মুখে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সেটা যেন খুব দূরে সরিয়া গেল।

লতিফ আনন্দ-উদ্ভাসিত চিত্তে বলিল,—"জীবনে-মরণে তুমি আমার। সুখে দুঃখে—তুমি আমার! সম্পদে বিপদে তুমি আমার। তুমি যে আমার হৃদয় আলো করিয়া আছ আনার উন্নিসা! এ হৃদয়ের মধ্যে ভাল বাসার হৈম সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছি যে—আমি তোমাকে। একটা সুখস্বপ্নের ঘোর, যাহার উন্মত্ততায় অভিভূত হইয়া,সংসারের একটা পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথে, অসম্ভব অদম্য উৎসাহের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি, করুণাময় বিধাতা, যে আমার সেই অতি দুর্ল্লভ সুখ-স্বপ্ন চূর্ণ করিয়া দিবেন,—এমন কোন পাপ তো আমি তাঁর কাছে করি নাই। তবে ভবিতব্য যদি অন্যরূপ হয়,—সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে তোমার ধ্যান, তোমার চিন্তা, আমি এ জীবন থাকিতে ছাড়িব না। খোদা সাক্ষী—তুমি আমার। আমার এই একপ্রবণ প্রেম জ্যোতির্ম্ময় হৃদয় সাক্ষী—তুমি আমার! জানিও তুমি আনার উন্নিসা—আমার এ অস্তিত্ব কেবল তোমারই জন্য। এ দুনিয়ায় যাহা কিছু স্পৃহনীয়, ভোগ্য, ইপ্সিত, সবই আমি হেলায় বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু এ প্রাণ থাকিতে তোমাকে নয়, তোমার চিন্তাকেও নয়।"

প্রাণের উচ্ছ্বাসে, লতিফ আজ অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল। এতটা প্রাণ খুলিয়া, সে আর কখনও তাহার মনের কথা আনারউন্নিসাকে বলে নাই, বা বলিবার কোন অবসর পায় নাই।

আর কিছু না বলিয়া লতিফ দ্রুতবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। আর তাহার জাগ্রত আবেগময় প্রাণের কথাগুলি, আনারের কাণে তখনও যেন অতি তীব্র ঝঙ্কারের সহিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। এর মধ্যে নবাব সুজাবেগের বাড়ীতেও একটী মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সেটি তাঁহার জননী রুকিনা বেগমের আকস্মিক মৃত্যু!

জামাল খাঁ,—অর্থাৎ আনার উন্নিসার স্নেহময় পিতা কন্যার এই বিবাহ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একমাস সময় লইয়াছিলেন। সেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও, যখন নবাব সুজাবেগ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে আর কোন জরুর তাগিদ দিলেন না, তখন জামাল খাঁ মনে মনে ভাবিলেন,—"হয়তো—রুকিনা বিবির মৃত্যুর সহিত, বিবাহ ব্যাপারটা এই খানেই খতম হইয়া গেল।"

কেন না তিনি খুব ভাল রূপই জানিতেন, এ বিবাহ ঘটাইবার জন্য রুকিনা বিবিরই খুব আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল।

মাতার মৃত্যুর পর, সুজাবেগ অপরিমেয় সম্পত্তির স্বাধীন অধিকারী হইলেন। যমুনার পর পারে, আগরা হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে, "আরাম-মঞ্জিল" বলিয়া তাঁহার এক প্রকাণ্ড উদ্যান বাটী ছিল। মাতার মৃত্যুর পর, তিনি সহর ছাড়িয়া এই "আরাম-মঞ্জিলেই" বাস করিতে লাগিলেন।

সুজাবেগের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না। রুকিনা বিবি--অর্থাৎ তাঁহার মাতা, যে তাহার কতক কতক জানিতেন না—তাহাও নয়। আর সুজার এই নষ্ট চরিত্রের কথা লইয়া তাহার সমাবস্থাসম্পন্ন প্রবীণ আমীর-ওমরাহদের মধ্যে যে একটা কাণাঘুসা ও গল্প গুজব হইত না, তাহাও নহে। তাহাদের মধ্যে দুই চারি-জনের বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল, কিন্তু সুজাবেগের চরিত্র সম্বন্ধে গূহ্য কথাগুলি তাঁহারা জানিতেন বলিয়া, রুকিনা বিবি বহুবার তাঁহাদের কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেও, তাঁহারা একটা না একটা সঙ্গত ওজর দেখাইয়া, সে প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

কোন বড় ঘরানার সহিত, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে এই ভাবে অকৃতকার্য্য হওয়াতেই, রুকিনা বিবি তাঁহার অপেক্ষা ধনে মানে অপেক্ষাকৃত নীচু ঘরে, পুত্রের জন্য সুপাত্রী খুঁজিতে লাগিলেন। অনেকের কন্যাকেই তিনি দেখিলেন—কিন্তু সকলের সঙ্গে তুলনায়,রূপেগুণে শ্রেষ্ঠা এই আনারউন্নিসাকেই তাঁহার পছন্দ

হইল। এই জন্যই তিনি নিজপুত্রের জন্মোৎসবকার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া আনারকে সেই বহুমূল্য রত্নহার উপহার দিয়াছিলেন।

মাতা যে অত শীঘ্র সহসা ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবেন, নবাব সুজা বেগ তাহা আদৌ ভাবেন নাই। আনার উন্নিসা তাঁহার প্রতিবাসী কন্যা। বহুবার তিনি আনারকে দেখিবার ও তাহার সঙ্গে কথা কহিবার অবসর পাইয়াছেন। কিন্তু আনারের সুবিমল সৌন্দর্য্য কখনও তাঁহার পাষাণের ন্যায় কঠিন প্রাণে, তখন একটী দাগ পর্য্যন্ত কাটিতে পারে নাই।

কিন্তু সেই উৎসব রাত্রে বিচিত্র পরিচ্ছদভূষিতা, অপূর্ব্ব রূপশালিনী আনারকে তিনি নূতন চক্ষে দেখিলেন। আনারের লোকবিশ্রুত সৌন্দর্য্য, যেন সেই দিন রাত্রে তাঁহার মনের ভিতর সিঁদ কাটিল।

সুজাবেগ মনে মনে ভাবিলেন,—"অনেক উচ্চপদস্থ ওমরাহের ঐশ্বর্য্যময়ী গরবিনী কন্যার অপেক্ষা, যেন এই আনার উন্নিসা রূপে গুণে, তাঁহার ঘরণী হইবার সর্ব্বাংশে যোগ্যা। এই জন্যই সুজাবেগ আনারের অভিমত জানিবার জন্য খুবই উৎসুক হইয়া তাহাকে পূর্ব্বোক্ত সেই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠক এ পত্রখানির কথা জানেন।

আনারের পত্রের উত্তর আসিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইতে পারে। কেন না—এ সম্বন্ধে তাহার কোন স্বাধীনতাই নাই। সে সম্পুর্ণরূপে তাহার পিতার ইচ্ছার অধীন। এইরূপ একটা অসহিষ্ণুতাময় চিন্তায় অধীর হইয়া, সুজাবেগ আনারের পিতা

জামাল খাঁকেও সেই দিন এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই দেখিয়া, জামাল খাঁ মনে যেন একটা শান্তি অনুভব করিলেন। ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে তিনি তাঁহার কন্যাকে এক চরিত্রহীনের হস্তে অর্পণ করিতে বড়ই নারাজ। তবে ভবিতব্য যদি সুজা বেগের সহিত তাঁহার কন্যার ভাগ্য বিজড়িত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি কোনরূপে বাধা দিতে সক্ষম নহেন। কেহ বা কবে দিতে পারিয়াছে?

সুজাবেগের প্রকৃত স্বভাব কিরূপ, তাহা দেখিতে হইলে—একবার আমাদের আরাম-মঞ্জিলে প্রবেশ করিতে হইবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকাণ্ড উদ্যান বাটীর কয়েকটা কক্ষ—দীপোজ্জ্বলিত। নবাব সুজাবেগ, উৎসুক চিত্তে যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু—যাহার আশা প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন—সে ত আসিতেছে না।

সহসা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। এক পরমা সুন্দরী যুবতী, সহাস্যমুখে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটু আদব কায়দার সহিত কুর্ণীশ করিয়া বলিল—"আরজ বন্দেগি! নবাব-সাহেব! বাঁদী হাজির।"

নবাব সুজাবেগ—কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন—"ছিঃ! ছিঃ! এত নিষ্ঠুর তুমি? এত দেরী করিতে হয়? আমি যে কতই ভাবিতেছি!"

সেই যুবতী, নবাবের পার্শ্বের এক সোফা অধিকার করিয়া বসিয়া, সুরমারঞ্জিত চোখে একটা শাণিত কটাক্ষ হানিয়া

বলিল—"এত দূর! এখনও আমার জন্য এত ভাবনা! এর পর সুন্দরী আনার উন্নিসা, তোমার মহল আলো করিয়া বসিলে, হয়তঃ এ বাঁদীকে তোমার মনেই থাকিবে না।"

নবাব সুজাবেগ্—তাঁহার প্রণয়িনীকে কোমল আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া বলিলেন—"ও সব রহস্য এখন থাক্। বানু! এত দেরী করিলে কেন বল দেখি? বোধ হয় আজ তোমার প্রাণের অতি অন্তরঙ্গ সেই আমীরউদ্দৌলার সম্বর্দ্ধনায় খুব ব্যস্ত ছিলে।

বাহার বানু মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"আবার সেই কথা। আমাকে জ্বালাইলেই কি তুমি সুখী হও! আচ্ছা তুমি সুখে থাক। আমি চলিলাম।"

এই কথা বলিয়া বাহারবানু দ্বারের কাছে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আরক্ত ঠোঁঠ দুখানি অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। সে যেন চলিয়া যাইতে উদ্যত।

খাঁসাহেব মনে মনে বুঝিলেন, কথাটা বলিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। সুতরাং তিনি বাহারের হাতখানি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন—"ঐ কথা বলিলে তুমি খুব রাগিয়া যাও, তাই বলিয়াছি।

বাহারের অভিমান ভাঙ্গিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"ওঃ! কি ভয়ানক কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাত্‌টা আজ নবাব সাহেব! দাও—দাও। একটু সেরাজি দাও। আগে জান্‌টা সতেজ হউক, তারপর যত পার রহস্য করিও।"

নবাব সুজা বেগ, স্বহস্তে গুলাববাসিত সেরাজি ঢালিয়া

বাহারবানুর—সম্মুখে ধরিলেন। বাহার, সহাস্যে বলিল—"তাও কি হয় জনাবালি? হুজুরের প্রসাদ না হইলেও কোন জিনিসই ত আমার ভাল লাগে না।"

সুজাবেগ সহাস্যে বলিলেন—"অতটা ভক্তি ভাল নয়। তুমি যে আমার কতটা ভাল বাস, তা আমি জানি।"

বাহার বানু। আর তুমিও আমাকে কতটা ভালবাস, তাহাও জানিতে আমার বাকি নাই।

সুজাবেগ। বটে! এখন এ কথা বলিবে বই কি? যাক্ সেরাজিটার সুগন্ধ উড়িয়া গেল যে!

এই কথা বলিয়া সুজাবেগ মদিরাপাত্র তাহার ওষ্ঠাধরের কাছে আনিয়া, তাহা হইতে কতকাংশ পান করিয়া, তাহার প্রিয়তমার সম্মুখে ধরিলেন।

পান পাত্র নিঃশেষ করিয়া বাহারবানু বলিল--"আজ তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করিতে আসিয়াছি।"

সুজা। এ বান্দার অপরাধ?

বাহারবানু। অপরাধ খুব!

সুজা। যদি তাই হয়—তাহা হইলে মার্জ্জনাও ত আছে।

বাহারবানু। পিয়ারা মেরে! অপরাধ বিশেষে মার্জ্জনার দাবি চলে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়!

সুজা আবেগভরে বাহারকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। সে ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তুমি যখন আমাকে বুকের ভিতর হইতে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা

করিতেছ, তখন সেই বুকে আমাকে টানিয়া লইবার কোন অধিকারই তোমার নাই।"

এই কথা বলিয়া, সুরমারঞ্জিত অপাঙ্গে বিদ্যুৎলহরী খেলাইয়া বাহারবানু সেরাজি পাত্রটী পূর্ণ করিয়া, সুজা বেগের হাতে দিয়া বলিল—"এই টুকু শেষ করিয়া নাও। তার পর খুব একটা কাজের কথা তোমায় বলিব "

কথাটা যে কি, আর তাহার জন্য বাহারবানু এত ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছে কেন, এই টুকু তলাইয়া বুঝিতে সুজাবেগের বড়ই গোলমাল ঠেকিতে লাগিল। যখন বাহারের অর্থের প্রয়োজন হইত, তখনই সে এইভাবে কাঁদুনী গাহিয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া হাসিমুখে চলিয়া যাইত। সুজা মনে মনে ভাবিলেন—এইবার হয়ত আবার টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। তাই তাহার প্রণয়িনী বাহারবানু এতটা দীর্ঘ ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছে।

সুজাবেগ পান পাত্র নিঃশেষ করিয়া, বাহারকে আর এক পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। এবার আর সে কোনরূপ বাহানা না করিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিল,—"একটা কথা শুনিতেছি,—সত্য কি? তুমি গোপনে গোপনে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছ কেন?"

সুজা চমকিত হইয়া বলিল,—"সে কি কথা!"

বাহারবানু গম্ভীর মুখে বলিল,—"তুমি নাকি বিবাহ করিবে?"

সুজা। কে বলিল ? মিথ্যা কথা !

বাহার। কখনই না। যে বলিয়াছে,— সে তোমার ভাবী পত্নীর পিতা, জামাল খাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ! তুমি বিবাহ করিবার জন্য এতই ব্যস্ত, যে শীলতার নিয়ম না মানিয়া তাহার কন্যা, আনার উন্নিসাকে নাকি প্রেমপত্র পর্য্যন্ত লিখিয়াছ।

সুজাবেগ কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর বাহারবানুর মুখখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া সহাস্য মুখে বলিলেন,—"এই ব্যাপার ! বড়ই দুঃখের বিষয়, যে তুমি দেড়মাস পূর্ব্বের একটা খুব পুরাণ সংবাদ, যাহা এখন অলীকে দাঁড়াইয়াছে, তাহা লইয়া আমার সহিত আজ বিবাদ করিতে আসিয়াছ।"

বাহারবানু বলিল—"সংবাদটা অবশ্য পুরাতন। কিন্তু বোধ হয় তোমার জননী যদি ইহলোক ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে হয়তঃ জামাল বেগের কন্যা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আনার উন্নিসার হুকুমে, আজ আমার এই পুরী প্রবেশ করা বন্ধ হইয়া যাইত। তা তুমি যা ভাল বুঝিবে,—তাই করিবে। আমি তোমার আশ্রিতা দাসী বই আর কিছুই নই। লোকে আদর করিয়া টাটকা ফুল, বুকের উপর গুঁজিয়া রাখে। ফুল বাসি হইলে তাহাকে বুক হইতে টানিয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া পদদলিত করে। তুমি এখন দেখিতেছি, সেই নীতির অনুসরণ করিতেছ ! বল দেখি, কার আশায় আজও আমি বুক বাঁধিয়া চলিতেছি ? সেই প্রথম মিলনের দিনে, তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কি

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে—তাহাও মনে কর নবাব! কোন অপরাধই আমি তোমার কাছে করি নাই। অতি নিষ্ঠুরের মত, অতি হৃদয় হীনের মত, আমাকে পদদলিত করিও না।

এই কথাগুলি বলিতেবলিতে, সেই ছলনাময়ী বাহারবানুর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। দুই এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল—সুজা বেগের হাতের উপর পড়িল।

সুজা বেগ চমকিয়া উঠিয়া, বাহারবানুকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"ছি! বাহার! এত লঘু তুমি! একটা তুচ্ছ অলীক বিষয়, যার ভিত্তি নাই, যাহার অস্তিত্ব নাই, তুমি কিনা তাহার উপর নির্ভর করিয়া এতটা বিচলিত হইতেছ?"

ছলনাময়ী বাহারবানু, সুজা বেগের কথায় অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল। সে আদরভরে নবাব সাহেবের দক্ষিণ হস্তটী নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, তাহা মৃদুভাবে টিপিয়া দিয়া বলিল—"প্রতিজ্ঞা কর তুমি—আমাকে স্পর্শ করিয়া, যে আর কখনও আনার উন্নিসাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিবে না।"

সুজাবেগের মনের ভিতর এই সময়ে ঠিক এর বিপরীত ভাবের কথাগুলি জাগিয়া উঠিল। নবাব মনে মনে বলিলেন—"তোমায় চিনিতে আমার বাকি নাই। ছলনাময়ী রাক্ষসী তুমি! আমাকে ধ্বংশ করাই তোমার অভিপ্রায়! কই এতদিন যে তোমার উপাসনা করিতেছি, তোমার প্রাণের

কথা যে কি, তাহা কখনও জানিতে পারিয়াছি কি ? রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া, তোমাকে রাজরাণীর মত সুখে রাখিয়া যে আনন্দ পাইব বলিয়া, অলীক সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলাম, তাহাও তুমি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছ। ছলনার মন্ত্রজালে বেড়িয়া তুমি কত দিন আর আমাকে এ অবস্থায় রাখিবে ? কে তুমি, যে তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ?"

"যখন দেখিলাম, প্রচুর অর্থ দিয়াও তোমার মন পাইলাম না, এত আদর যত্নেও তোমার হৃদয়ের একটু সামান্য অংশও অধিকার করিতে পারিলাম না—যখন দেখিতেছি, সুখের বদলে দুঃখ, শান্তির বিনিময়ে অশান্তি, আনন্দের বিনিময়ে বিষাদই আমার দানের প্রতিদানরূপে তুমি আমায় আনিয়া দিতেছ, তখন আর কেন তোমার উপাসনা করি ? কলুষিত নরকের পথে এতদিন ঘুরিয়া মরিয়াছি। এখন স্বর্গের দ্বার কোথায় তাহা আমাকে একবার খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।"

সুজাবেগকে এইভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া বাহারবানু বলিল · "ইতস্ততঃ করিতেছ কেন নবাব সাহেব ! কি ভাবিতেছ তুমি ? আমার এ সামান্য অনুরোধ রক্ষায় কেন এত সন্দেহ ? কেন এত সংকোচ ?"

সুজাবেগ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিত ভাবে বলিলেন, "না-না—কিসের সংকোচ ? কিসের সন্দেহ ? যদি কোথাও শান্তি পাই, তাহা তোমার নিকটে। যদি কোথাও আরাম পাই—তাহা তোমার সাহচর্য্যে ! এ মরুময় জীবনের শান্তিদায়িনী

স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী তুমি! ছিঃ—আমার গভীর প্রেমে অতটা সন্দেহ করিও না! একটা সামান্য বিষয়ে কেন তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে যাইব—যাহা করিতে আমার এ চিত্ত স্বাধীন ইচ্ছায় সম্পূর্ণ শক্তিবান। আমার কথার উপর কি তোমার একটুও বিশ্বাস নাই বাহারবানু?"

একটা ব্যাকুলতাময় আগ্রহের সহিত বাহারের মুখের দিকে চাহিয়া, এমনভাবে সুজা বেগ এই কথাগুলি বলিলেন—"যে বাহারবানুর মনে একটা ধারণা জন্মিল, এগুলি সত্য সত্যই নবাব সাহেবের মনের কথা।

বাহার আর এক পাত্র সেরাজি ঢালিয়া, নবাব সুজা বেগের হাতে দিল। নিজেও এক পাত্র পান করিয়া প্রফুল্ল মুখে বলিল—"তবে নবাব সাহেব! আজ এ বাঁদী বিদায় পাইতে পারে কি? রাত খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে।"

আগে আগে নবাব সুজা বেগ এই রূপসী বাহারবানুর সাহচর্য্যে খুবই একটা আনন্দ পাইতেন। কিন্তু এখন যেন সেরূপ আনন্দ আর পান না। এই বাহারের সাহচর্য্যে কত দিন, কত রাত, অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেমলীলায় কাটিয়া গিয়াছে। তবুও তাহাতে বিরক্তি দেখা দেয় নাই। আগে এক মুহূর্ত্তের বিরহ বড়ই কষ্টকর বোধ হইত। এখন ত আর সেই আগ্রহময় ব্যাকুল ভাবটা নাই। এখন বেশীক্ষণ বাহারবানুর সঙ্গে থাকিতে হইলে যেন তাঁহার অতি কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। এখন যেন দীর্ঘ বিরহে একটু তৃপ্তি ও শান্তি বোধ হয়।

নবাব সাহেব অগত্যা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহারবানুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"যদি খুবই প্রয়োজন থাকে যাইতে পার। তবে এখন আদাব!"

বাহারবানু হাসিমুখে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিল—"বন্দেগি! যেন এ বাঁদীর উপর চিরদিনই এইরূপ একটা অনুগ্রহ থাকে।"

আর কিছু না বলিয়া, সে একটু মৃদু হাসিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল। তাহার দ্রুতগমন ভঙ্গীতে বোধ হইল, যেন একখানা বিদ্যুৎ সেই কক্ষ হইতে সরিয়া গেল। বাহিরে বাহারের নিজের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সুতরাং সে সেই গভীর রাত্রে গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাহারবানুকে বিদায় দিয়া নবাব সুজাবেগ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চিন্তিতভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র হাত বাক্সের নিভৃত স্থান হইতে, একখানি চিত্র বাহির করিয়া, কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সেই চিত্রের উপর স্থিরভাবে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া রহিলেন।

কিন্তু অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ দেখাতেও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি আলোকের খুব নিকটে আনিয়া, সেই ক্ষুদ্র চিত্রখানি একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তির সহিত দেখিতে লাগিলেন।

তারপর সেই চিত্রখানি যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রাখিয়া এক সোফার উপর বসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—"এই চিত্রে অঙ্কিত এই আনার উন্নিসা দেবী, আর এই বাহারবানু

যে এইমাত্র আমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে পিশাচি! আনারের রূপের তুলনায় এই বাহারবানু? সে যে এর বাঁদী হইবার যোগ্যা নয়! এই বাহার আমার অসংখ্য অযাচিত অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে, কেবল জ্বালাই আনিয়া দিয়াছে। আমি কি এই শান্তিময়ী আনারকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া আবার বেহেস্তের আলোকময় পথে ধীরে অগ্রসর হইতে পারিব না? আনারের পিতা, এক মাস সময় চাহিয়াছেন। কিন্তু দুই মাস ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি এই দেবতার ভোগ্য, দুর্লভ রত্নকে লাভ করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছি কই? কালই আমি আনারউন্নিসার পিতাকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখিব। এই ছলনাময়ী বাহারবানুর সাহচর্য্য, দিনে দিনে আমার পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছে।

মুক্তবায়ুতে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার জন্য, সেরাজির নেশাটা ক্রমশঃ জমাটভাব ধারণ করিতেছিল। নবাব সুজা বেগ অগত্যা চিন্তাসূত্রজাল ছিন্ন করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন।

কিন্তু নিদ্রাতেও তাঁহার নিস্তার নাই। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন এই দেবীদুর্লভ রূপসমন্বিতা আনার উন্নিসা, যেন তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া সস্মিত বদনে বলিতেছে—"ভয় কি তোমার নবাব সুজা বেগ! এই দেখ আমি তোমার বাঁদী হইতে আসিয়াছি। তোমার ষোল আনা প্রাণ, আর যত্ন মায়া মমতা আমায় দাও, আমি তার পরিবর্ত্তে তোমায় বেহেস্তের পবিত্র শান্তি আনিয়া দিব। যে পথে তুমি এখন চলিতেছ—তাহা তো জাহান্নমের পথ!

বাহারবান্থুর কলুষিত চিত্র তোমার মনঃক্ষেত্র হইতে মুছিয়া ফেল। একবার আমার দিকে ভাল করিয়া চাও। তোমার ষোল আনা প্রাণ আমায় দিয়া দেখ দেখি, মরজীবনের প্রকৃত সুখ কোথায়? জাহান্নমে—না বেহেস্তে!"

নবাব সুজা বেগ যেন সানন্দে হস্ত প্রসারণ করিয়া আনারকে বক্ষে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। কিন্তু কোথায় সে আনার উন্নিসা! আনার ত নাই। এ যে তার ছায়ামূর্ত্তি! সেই ছায়া মূর্ত্তি নিমেষ মধ্যে যেন তাঁহার শয্যা পার্শ্ব হইতে সরিয়া গিয়াছে।

নবাব সুজা বেগ চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার খাস ভৃত্য মজঃফর, তাঁহার সম্মুখে জোড় হস্তে হুকুম অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

নবাব সুজা বেগ মনে মনে বলিলেন—"ইহাকেই বলে অদৃষ্টের কঠোর ব্যঙ্গ! জাগরণে জ্বালায় জ্বলিতেছি। স্বপ্নে একটু সুখ ভোগ করিতেছিলাম। তাহাও আমার নসীব সহ্য করিতে পারিল না। হায়! এমন কি ভাগ্য করিয়াছি, যে আনার উন্নিসা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিবে? তাহার সৌরভময় পবিত্র নিশ্বাসে, আমার এ কক্ষ পবিত্র হইবে?"

নবাব শয্যা হইতে উঠিয়া, একটু বিরক্তির সহিত মজঃফরকে বলিলেন—"খপর কি বান্দা?"

মজঃফর প্রথামত কুর্ণীস করিয়া বলিল—"বেলা হইয়াছে শয্যা ত্যাগ করুন। আজ আপনার সম্রাট-দরবারে যাইবার দিন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

এই বাহার বানুর প্রকৃত পরিচয় একটু দেওয়া প্রয়োজন। বাহারবানুর প্রকৃত নাম হইতেছে আর্জ্জমন্দবানু। তাহার আদি বাসস্থান পারস্য বা ইরান। তাহার পূর্ব্ব পরিচয় কি, তাহা কেউই জানে না। সে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাও কেউ জানিত না। তবে তাহার আচার ব্যবহার ধরণ ধারণ দেখিয়া, তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই বোধ হইত। অতি দুঃস্থ পিতা মাতার সঙ্গে সে ইরান ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র রূপ লইয়া এই হিন্দুস্থানে ভাগ্য পরীক্ষার্থে আসে। সে বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, তাহাও কেহ জানে না। আর বাহারবানু নামেই সে আগরায় পরিচিত। নৃত্য গীতে সে খুবই পটীয়সী। কলকণ্ঠী গায়িকা হিসাবেই তাহার নাম ডাক আরও বেশী। খেয়াল ধ্রুপদ গাহিতে, আগরার কোন গায়িকাই তাহার সমকক্ষ ছিল না। বড় বড় নামজাদা ওস্তাদেরা, তাহার নিকট হারি মানিয়া যাইতেন। বাণা, এস্‌রার, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রবাদনে এই আরামবানুর কৃতিত্ব খুবই ছিল। আর তাঁহার বিশেষত্ব এই, ওমরাহ, আমীর ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকের সহিত সে বেশী মেলামেশা করিত। তাঁহাদের বিলাসোদ্যানে কিম্বা আরামগৃহে, আরামবানুর নাচ গানের মজলিস্ বসিত। মোটের উপর সাধারণ লোকে তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারিত না। আর সেও পরদানশীন জেনানার মত, নিজের আবরু সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিত।

সে ইতিপূর্ব্বে একজন উচ্চপদস্থ আমীরের রক্ষিতা ছিল। তিনিই সখ্ করিয়া তাহার সাবেক আর্জ্জমন্দ নামটী পরিবর্ত্তন করিয়া বাহারবানু নাম রাখেন।

বাহারবানুর গুণের ন্যায়,রূপেরও একটা খুব যশ ছিল। তাহার মদিরালসময় আঁখি দুটীর কেমন যে একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, অতি সহজেই সে লোকের চিত্তের উপর একটা শক্তি বিকাশ করিত। যে ওমরাহের কথা বলিতেছি, তাঁহার অধীনস্থা হইয়া থাকিবার সময়ই এই বাহারবানুর যথেষ্ট ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তাহার দরিদ্র পিতা মাতা, এই হতভাগিনী বিপথগামিনী কন্যার তখনকার সুখসমৃদ্ধির অবস্থা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কেন না—এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের এক বৎসর পূর্ব্বেই. তাঁহারা পরলোকের পথিক হন।

মানবের ভাগ্যটা যেন নদীর মত জোয়ার ভাঁটার নিয়মের অধীন। পূর্ব্বোক্ত ধনী ওমরাহের আশ্রয়াধীনে থাকিবার সময় এই কুহকময়ী বাহারবানুর অদৃষ্টের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। এক ক্ষুদ্র প্রাসাদতুল্য বাটিতে সে বাস করিত। দাসী বাঁদী, যান বাহন, এলবাব পোষাক, প্রভৃতি বড়মানুষির যে সব চিহ্ন, তাহার সবই হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ওমরাহ মহলে তাহার খুবই পসার হইয়াছিল। এমন কি, অনেক সময়ে মোগল শাহজাদাগণ, এই সংগীতকুশলার সঙ্গীত-চাতুর্য্য শুনিবার জন্য, ছদ্মবেশে এই বাহারবানুর আলয়ে উপস্থিত হইতেন।

যে নামজাদা আমীরের আশ্রয়ে, সে রাজরাণীর মত সুখ

ভোগ করিতেছিল, একদিন এই রূপসী বাহারবানুর কক্ষ মধ্যেই, প্রভাতস্থচনার সঙ্গে, সেই আমীরের মৃতদেহ পাওয়া গেল। অবশ্য এই ব্যাপার ঘটায়, আগরা সহরে দিন কয়েকের জন্য একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। কেননা এই ওমরাহ,খুব একজন নামজাদা ধনী ছিলেন। বাহারবানুর শত্রুপক্ষ,এই হত্যা ব্যাপারে বাহারবানুকে জড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শত্রু অপেক্ষা তাহার অনুগ্রহ-প্রার্থী মিত্র সংখ্যাই খুব বেশী। আর এই মিত্রগণ আবার গণনীয় ওমরাহ শ্রেণীর লোক। সুতরাং এই হত্যা-কাণ্ডের জন্য, বাহারবানুকে কোনরূপ জখমে পড়িতে হইল না বটে, তবে এই শোচনীয় ব্যাপারের পর হইতে, তাহার সৌভাগ্যের প্রবল স্রোতে যেন একটা ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল। তাহার পসার প্রতিপত্তি কমিয়া আসিল।

এই দুনিয়ায় যেমন কোন জিনিষই চিরদিন থাকে না. কাল-ক্ষয়ের সহিত বাহারবানুর নামে এই হত্যার কলঙ্কটাও ক্রমশঃ সেইরূপ লোকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মাস কয়েকের জন্য সহর ত্যাগ করিয়া, সে আগরার প্রান্তসীমায় এক ক্ষুদ্র উদ্যান বাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিল।

কোন এক ওমরাহের গৃহে এক সঙ্গীতের মজলেসে, নবীন নবাব সুজাবেগ, এই বাহারবানুর রূপ দেখিয়া, গান শুনিয়া, বড়ই মোহিত হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ যাতায়াতে আর মেশামেশিতে উভয়ের মধ্যে একটা বেশীগোছের অন্তরঙ্গ ভাব জন্মিয়া যায়। এই

ছলনাময়ী নারীর কৌশল জালে পড়িয়া, নবাব সুজাবেগ এতটা আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, জননীর পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ স্বত্বেও তিনি বিবাহ-বন্ধনে কোন রূপেই আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না। এই জন্যই তাহার মাতা, এই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা আনার উন্নিসার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ ঘটাইতে অতটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এই চেষ্টা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু ঘটায়, এই বিবাহ ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ বাধিয়া যায়।

কাণাবূষায় সুজাবেগ একদিন শুনিলেন যে, আমীরউদ্দৌলা নামক একজন হীন প্রকৃতির নগণ্য লোক, বাহারবানুর বড়ই অন্তরঙ্গ হইয়াছে। তাহার এতটা সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে, যে গুপ্তভাবে সে তাহার বাটীতেও যাতায়াত করে।

এই আমীর-উদ্দৌলার কথা তুলিয়া, তিনি মধ্যে মধ্যে বাহারবানুকে রহস্য করিতেন। পাকে প্রকারে, নানা রকমে জেরা করিয়া তাহার মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু চতুরা বাহারবানু নবাবের এ সন্দেহটা যে অলীক ও কল্পিত, এইটাই নানা কৌশলে প্রমাণ করিয়া দিত। তাহার মধুর অপাঙ্গে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল কটাক্ষ ছিল, ভাষায় ভালবাসার ছলনা ছিল—ভুবনমোহন রূপ ছিল, ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি ছিল, আর তার অম্বুজলাঞ্ছিত নেত্রে অতি সামান্য চেষ্টাতেই অশ্রুধারা বাহির হইত। এ সম্বন্ধে কাজেই তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইত না। এমন কি অনেকবার সুজাবেগ

এই আমীরউদ্দোলাকে ধরিবার জন্য, অতি গভীর নিশীথেও সহসা বাহারবানুর কক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার এই সন্দেহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন নাই।

আনারউন্নিসার পূর্ব্বের ছবিখানা, সুজার মাতা রুকিনা বিবিই, তাঁহাকে আনাইয়া দেন। যাহাতে আনারের এই ভরা যৌবনে, সুজার সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা হয়, এজন্য মাসের মধ্যে দুই একবার তিনি আনারকে ইদানীং প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। হিতাকাঙ্ক্ষিণী জননীর, বিপথগামী এই পুত্রকে গৃহ-বাসী করিবার এ চেষ্টা, যে একাবারে নিষ্ফল হয় নাই, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আনারের গুণের কথা পড়সীরা সকলেই জানিত। তাঁহার রূপেরও একটা খুব প্রশংসা ছিল। আর আনারউন্নিসার নিষ্কলঙ্ক রূপমাধুরী, যে এই ব্যভিচার-কলুষিত নবাব সুজা বেগের হৃদয়ে একটা দাগ কাটিযা দিয়াছিল, আর তিনি যে এই আনারকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য খুবই উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত পূর্ব্বের পত্র হইতেই প্রকাশ!

মাতার মৃত্যুর পর, বিষয়াদির সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এতদিন বিবাহ সম্বন্ধে কোন মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণে পবিত্র দাম্পত্য জীবন উপভোগের যে ক্ষীণ স্বপ্নোজ্জ্বল রশ্মিটুকু ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, এই ছলনাময়ী শয়তানী বাহারবানু সে টুকুকে এক

ফুৎকারে নিভাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পারিয়াছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

রূপজ মোহ ঠিক যেন ধাতু পাত্রে কলঙ্কের দাগের মত। বিশেষ কোন কারণে প্রাণে আঘাত না লাগিলে, মনটাকে এ কলঙ্ক হইতে ভালরূপে ঘষিয়া মাজিয়া না লইলে, এ মোহ সহজে অপসারিত হয় না। অর্থাৎ সোজা কথায় যাহাকে দাগা পাওয়া বলে, সেইরূপ কোন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার একটা হওয়া চাই।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপে তৈলদান করিলে, তাহা যেমন সহসা জ্বলিয়া উঠে, বা আরও কিছুক্ষণ জ্বলে, নবাব সুজা বেগের অবস্থাটাও এখন ঠিক সেইরূপ। তিনি বাহারবানুকে সম্মুখে দেখিলে, কাছে পাইলে, যেন হাতে স্বর্গ পাইতেন। আবার কিয়ৎক্ষণ তাহার সাহচর্য্যে থাকিলেই যেন আনন্দের পরিবর্ত্তে একটা বিরক্তি আসিয়া দেখা দিত।

আর একটা গূহ্য ব্যাপার, যাহাতে এই বাহারবানু আর নবাব সুজা বেগ, অবিচ্ছেদ ভাবে জড়িত ছিলেন। সেটা আমরা বলিব না ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের এই উপন্যাসের সহিত তাহার একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তাহা বলিতে হইল।

তখন আগরা সহরে "প্রমারা" খেলার খুবই প্রচলন ছিল। ইহার প্রতিকারের জন্য সম্রাটের আইন কানুন অবশ্য খুবই কঠোর ছিল। কিন্তু সহরের অতি নিভৃত গুপ্ত স্থানে, এমনভাবে এই সব সর্ব্বনেশে খেলা চলিত যে, অতি সুচতুর রাজকর্ম্মচারীরাও কোনমতে তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত পাইতেন না। আবার তাঁহাদের

মধ্যে যাঁহারা এই সব গুপ্ত আড্ডার সন্ধান জানিতেন, তাঁহারাও কোন কথাই প্রকাশ করিতেন না। কেননা, তাঁহারাও ক্রীড়ক দলের মধ্যে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মৃত্যু নিশ্চয়, তাহাও তাঁহারা বুঝিতেন।

আমাদের যুবক নবাব সুজা বেগ ও বাহারবানু উভয়েই শ্রেষ্ঠদরের জুয়াড়ি। প্রেমের অভিনয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বাস আর প্রীতির অভাব ঘটিলেও, এই প্রমারা খেলার সময়ে আত্মীয়তার বাঁধনটা খুবই জমিয়া যাইত।

আগরায় এই বাহারবানুর উদ্যান-বাটীর নীচের কক্ষে, আর "ইস্‌মালিয়া" কাফিখানার একটী অতি গোপনীয় স্থানে, প্রমারার দুইটী প্রধান আড্ডা ছিল। এই আড্ডাতে বাজে লোকের প্রবেশের কোন উপায়ই ছিল না। জনকয়েক বিশেষ পরিচিত সম্ভ্রান্ত ওমরাহ, অতি গভীর নিশীথে এক গুপ্ত দ্বার দিয়া আড্ডায় প্রবেশ করিয়া খেলা জমাইতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের নবাব সুজা বেগ ও এই বাহারবানু, এই দুই আড্ডার দলভুক্ত।

বাহারবানু, প্রমারার একজন পাকা খেলোয়াড়। নবাবেরও এই খেলার উপর ভারি ঝোঁক। কাজেই প্রেমের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে একটা বাঁধাবাঁধির শিথিলতা ঘটিলেও, প্রমারার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে, একটা খুব মাখামাখি সম্পর্ক ও একান্ত বিশ্বাসের ভাব ছিল।

বাহারবানু প্রায়ই বাজি জিতিত। দুদশ টাকার নয়, বারে বারে দুশো, পাঁচশো, হাজার দুহাজার টাকার বাজী। উভয়ের

মধ্যে বন্দোবস্ত ছিল, বাহারবান্নু, নবাবের টাকা লইয়া খেলিয়া যে বাজী জিতিবে, তাহার মুনফার অর্দ্ধেক টাকা, সে নবাবের নিকট পুরস্কার বলিয়া আদায় করিবে। বাকী অর্দ্ধেক নবাবের।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে বড় লোকের মধ্যে আর এক রকমের আমোদের প্রচলন ছিল। এটা বাজ্ শিক্‌রী, ও কবুতরের লড়াই। ইহাতেও প্রমারার মত টাকা লইয়া বাজির খেলা হইত। তবে প্রমারা এক সঙ্গে দশজনে বসিয়া খেলিতে পারিত, দান ফেলিতে পারিত। এ খেলাতে সেরূপ নিয়ম ছিল না। দুই জনের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল, আর ইহার প্রত্যেক বারের বাজির পরিমাণ, দুই হাজার আসরফির নীচে ছিল না।

এই খেলার নিয়ম এই—যে দুই জনের মধ্যে ক্রীড়া চলিবে, তাঁহারা দুইদিকে বসিতেন। চিড়িয়াদের লড়াই করিবার জন্য খুব খানিকটা ফরদা জায়গা মাঝে রাখিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহারা চারি দিক ঘেরিয়া থাকিতেন। বাজীর টাকা সকলের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইত। যাঁর পাখী জিতিত, তিনিই পুরস্কারের টাকাটা লইতেন।

নবাব সুজা বেগের এই পাখীর লড়াইয়ের ব্যাপারে খুব একটা ঝোঁক ছিল। এজন্য তিনি অনেকবার অনেক টাকা খেসারত দিয়াছেন। কিন্তু যে বারে তিনি বাহারবান্নুর শিক্ষিত বাজ ও শিকরা লইয়া খেলিতেন, সেইবারে তাঁহার নিশ্চয়ই জিত হইত।

এই প্রেম ও প্রমারাই তাঁহাকে বাহারবান্নুর সহিত

বিশেষভাবে কিছুদিনের জন্য জড়িত রাখিয়াছিল। প্রেমের নেশার জমাটী ভাবটা ক্রমশঃ ছুটিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু এক সঙ্গে প্রেমারা খেলিবার নেশাটা ঠিক সেইরূপই ছিল।

অতুল ঐশ্বর্য্য—নবাব সুজা বেগের। তাঁহার পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাতে তিনি চিরদিনই নবাবী চাল বজায় রাখিয়া চলিতে পারিতেন। সেকালে এই সব বাজী রাখিয়া খেলা, এইভাবে উপনায়িকা পালন, বড় মানুষির একটা অঙ্গ ছিল বলিয়া, নবাব সুজা বেগ খুবই অপব্যয়ে মাতিয়া উঠিলেন।

অপ্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, অনেক আমীর ওমরাহই এই প্রমারা ও গুপ্তপ্রেমের অভিনয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিত। আর সকলেই একই শ্রেণীর পাপী বলিয়া, কেহ কাহাকে ঘৃণা করিত না, কেহ কাহার কুৎসা কীর্ত্তন করিত না। ধরিতে গেলে, এই প্রমারা খেলাটা যেন পুরুভুজের মত অমর। কেন না, এই বিংশ শতাব্দীতেও ইহা পরিবর্ত্তিত আকারে, আজও পর্য্যন্ত নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারি ও বার্লিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতের রাজধানীতে এখনও প্রচলিত। এখনকার খেলার প্রণালী অবশ্য বিভিন্ন, কিন্তু মহাধনীর ধ্বংশ সাধন, একই নিয়মে হইয়া থাকে।

ধনী ওমরাহ, নবাব সুজা বেগের ও বাহারবানু সম্বন্ধে আমরা উপরে যে পরিচয় টুকু দিয়াছি, এই আখ্যায়িকার সঙ্গে অগ্রসর হইবার পক্ষে, তাহাই যথেষ্ট। পরের আর সব অদ্ভুত ঘটনার পরিচয়, পাঠক-ক্রমশঃ পাইতে থাকিবেন।

বাহারবানুকে সেদিন বিদায় করিয়া দিবার পর হইতে, সুজা

বেগ তাঁহার মনে কেমনতর একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়টা যেন একাবারে শূন্য হইয়া পড়িল। বর্ষার মেঘের মত, চিত্ত সর্ব্বদাই যেন ঘোর বিষণ্ণতায় সমাচ্ছন্ন। সেই চন্দ্রালোকিত নিশীথে, প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্য্য বিভূষিতা হইয়া হাসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষে তাহা বড়ই তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেরাজির আধার সম্মুখেই ছিল। সুজা বেগ—চিত্তের অশান্তি দূর করিবার জন্য, আর এক পাত্র পান করিলেন। তার পর চারিদিকে চাহিয়া, এক গোপনীয় স্থান হইতে আনারের সেই তস্বীর খানি বাহির করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী আলোকে পূর্ব্বদিনের মত সতৃষ্ণনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরস চিত্তটার মধ্য হইতে, পূর্ব্বের সেই অবসন্নভাবটা যেন একটু সরিয়া গেল।

সুজা বেগে, সেই চিত্রখানি কিয়ৎক্ষণ মনোযোগের সহিত দেখিয়া অস্ফূটস্বরে বলিলেন—"শান্তির আশায়, সুখের আশায়, এ দুনিয়ায় পাপ পাথারে মগ্ন হইয়াছি, কিন্তু সুখ ও শান্তি পাইয়াছি কি? পাইয়াছি—কেবল আশার বদলে—নিরাশা, সুখের পরিবর্ত্তে—দুঃখ, আনন্দের বিনিময়ে—বিষাদ! আনারউন্নিসা! কি সুন্দর রূপ বিধাতা তোমাকে দিয়াছেন? খালি কি রূপ? শুনিয়াছি, গুণও ত তোমার কম নয়! তোমার সঙ্গে সেই উৎসব রাত্রে যতটুকু ছিলাম, বোধ হইতেছিল যেন স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছি। কি সুমিষ্ট কথা! কি বীণানিন্দিত স্বর!

কি প্রেম ও সরলতাময় সলজ্জ চাহনী, আর কথা বলিবার কি সুন্দর ভঙ্গি !

এস শান্তিদায়িনী আমার এই জ্বালাময় গৃহ কক্ষে ! আমার এ পাপকলুষিত গৃহে পূণ্যের চিরবসন্ত ফুটিয়া উঠুক । এস আমার এই তাপিত বক্ষে, আমার এ অগ্নিময় হৃদয় শান্ত হউক ।

আঃ ! কি তৃপ্তি এখনি অনুভব করিতাম, যদি চিত্রে চিত্রিত এই মূর্ত্তি, এই মুহুর্ত্তে জীবনময়ী, ভাষাময়ী হইয়া উঠিত ! আমার সর্ব্বস্ব একদিকে । আর আনার ! তুমি একদিকে । আমার এ অতুল ঐশ্বর্য্য, পদগৌরব, সমাজে সম্ভ্রম, রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠা, সবই যদি তোমার রাতুল চরণে সমর্পণ করি, তাহা হইলেও কি তোমাকে আমি পূণ্যময়ী পত্নী রূপে পাইব না ?

তুমি আমার প্রতিবেশিনী । প্রথম কিশোরে কতবার তোমায় দেখিয়াছি, কিন্তু তখন ত তোমার এ বিশ্ব বিমোহন সৌন্দর্য্য ছিল না । তোমার কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে, আবার দেখিয়াছি, তখনও আমার এ হৃদয় কপাট রুদ্ধ ছিল, নেত্র অন্ধ ছিল । দেখার মত করিয়া তখন ত কিছুই দেখি নাই ! তোমাদের অবস্থা এখন মন্দ হইয়াছে, এজন্য অনেক সময় তোমাদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতাম । এক সর্ব্বনাশিনী মোহিনীর মায়ার ফাঁদে পড়িয়া, আমি যে একেবারে অন্ধ হইয়া আছি !

না—না, আনারউন্নিসা ! আমি তোমায় চাই । যে উপায়ে পারি, তোমায় আমি আপনার করিব । তোমাকে আমার জীবনের সঙ্গিনী করিব । আরাধ্য দেবী করিব ।"

আবেগভরে নবাব সুজা খাঁ, শেষের এই কথাগুলি খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন। সে কথাগুলি লুফিয়া লইয়া কে যেন দ্বার পার্শ্ব হইতে বলিল—"বটে বিশ্বাসঘাতক! এই তোমার ভালবাসা! এই তোমার প্রতিশ্রুতির মূল্য ?"

নবাব সুজা বেগ দেখিলেন—বাহারবানু তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একটা উপেক্ষার হাসি তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটাইয়া তুলিয়া, স্থিরভাবে সে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

বাহারকে দেখিয়া, নবাব সুজা বেগ একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই মুখের সে ভাবটা পরিবর্ত্তন করিয়া, হাস্য মুখে বলিলেন,—"আবার কি মনে করিয়া আজ আবার আসিলে ?"

বাহারবানু সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"কেন আসিয়াছি, তাহা কি বুঝিতে পারিলে না নবাব সুজা বেগ ?"

সুজা বেগ বাহারের হাত ধরিয়া, তাহাকে কাছে বসাইতে গেলেন। সে বসিল না। বলিল—"এই আগরা সহরের একজন ধনীশ্রেষ্ঠ ওমরাহের প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটা অল্প, সেটা যতক্ষণ না জানিতেছি, ততক্ষণ তোমার কোন কথাই শুনিব না ?"

নবাব সুজা বেগ, একথায় বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একটু রুষ্ট স্বরে বলিলেন—"যে প্রতিশ্রুতি করিতে পারে, সে প্রয়োজন হইলে সে প্রতিশ্রুতি পালন না ও করিতে পারে ?"

বাহারবান্নু একটু ভ্রুকুটীভঙ্গি করিয়া বলিল—"আর এই প্রতিশ্রুতি অপালনে, যাহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে, সে তাহার স্বার্থের অনিষ্টকারীর কার্য্যে বাধা দিতেও সক্ষম, এটাও ত ঠিক্ নবাব সাহেব!"

নবাব সুজা বেগ, এই বাহারবান্নুকে চিনিতেন। তাঁহার হৃদয়ের অনেক দুর্ব্বলতা, তাঁহার অনেক গুপ্ত ব্যাপার, এই বাহারবান্নু জানে। তিনি একদিন, তাহার রূপ দেখিয়া মজিয়া, তাহাকে যে সব প্রেম পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক পদস্থ ওমরাহের কুৎসা আর সাংসারিক গুহ্য কথা বর্ণিত ছিল। এই পত্রগুলিও বাহারের হস্তগত। বিশেষতঃ সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে ইচ্ছুক, দুই জন শাহজাদাকে তিনি গোপনে অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার যে প্রতিশ্রুতি করেন, তাহাও বাহারবান্নুর গুপ্ত গৃহে হইয়াছিল। নানা বিষয়ে তিনি বাহারবান্নুর শক্তির অধীন! সহসা এ শক্তিপাশ ছিন্ন করা, তাঁহার পক্ষে অতি অসম্ভব। এই সমস্ত কারণেই তিনি এদানীং বাহারবান্নুকে বাহিরে ভালবাসা দেখাইলেও, অন্তরে একটা বিরক্তির ভাব পোষণ করিতেন। কিসে তাহার কবল হইতে কৌশলে মুক্ত হইবেন, তাহাই ভাবিতেন।

নবাব সুজা বেগ দেখিলেন, তখন তাঁহার হারকাতের বাজি পড়িয়াছে। আর বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, হয়তঃ তাঁহার পুরা মাত্রায় হার হইয়া যাইবে।

এজন্য তিনি আসন হইতে দ্রুতপদে উঠিয়া, বাহারকে কঠিন

আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া, তাঁহার কাছে আনিয়া বসাইলেন। বাহার জোর প্রকাশ করিয়াও, নবাবের সেই প্রেমালিঙ্গন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না।

সুজা বেগ নানা মিষ্ট কথায়, বাহারকে শান্ত করিলেন। ছলনাময়ী বাহারবানু বুঝিল, যতদূর ফাঁস টানিয়াছি তাহাই এখন যথেষ্ট। আর বেশী কষাকষি করিলে হয়তঃ হিতে বিপরীত হইবে। কাজেই সেও ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

বাহারকে লইয়া, নবাব সুজা বেগের সেই রাত্রিটা এক রকম আনন্দে কাটিয়া গেল। প্রভাতে, বাহার নবারের নিকট বিদায় লইয়া, অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মুখে আরাম মঞ্জিল ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার পর, পূর্ণ একটী সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন কিছুই ঘটে নাই।

বাহার ইহার পর এক সপ্তাহ "আরাম মঞ্জিলে" আসে নাই বটে, তাহা হইলেও নবাব সুজা বেগ তাহার বাটীতে গিয়া তাহাকে খুবই আপ্যায়িত করিয়া আসিয়াছেন। বাহারকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এর মধ্যে একদিন তাহাকে লইয়া "ইসমালিয়ার" প্রমারার আড্ডায় গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে নবাব সুজা বেগের টাকাতে খেলিয়া, বাহারবানু সেদিন পাঁচ শত আসরফি জিতিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং সেও নবাব সুজা বেগের আদরের মাত্রা পূর্ব্বের চেয়েও বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু যাহার সাহচর্য্যে তৃপ্তি নাই, তাহার উপাসনা করিতে সুজা বেগ আর প্রস্তুত নহেন। বাহারের ব্যবহারে তাঁহার মনটা

খুবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবে তিনি, প্রকাশ্যে পূর্ব্ববৎ খুব একটা আনুরক্তি ও সোহাগের ভাব দেখাইয়া, অন্তরে সর্ব্বদাই ভাবিতেন, কিসে এই সর্ব্বনাশিনী ছলনাময়ী বাহারবানুর কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই গুপ্ত পত্রগুলি আদায় করা যায়।

মানুষ যে কাজে বাধা পায়, সে কাজ সিদ্ধ করিতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। নবাব সুজা বেগ বড়ই নির্ব্বন্ধবান লোক। নানাদিক দিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি স্থির করিলেন—"পবিত্র দাম্পত্য জীবনের সূচনা না করিতে পারিলে, এ মহাপাপের প্রলোভন হইতে মুক্তি পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।"

এই সব ভাবিয়াই, তিনি আনার উন্নিসার পিতা জামাল খাঁকে এই দীর্ঘকাল পরে আর একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন। সে পত্রে আনার উন্নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ কার্য্যটা যাহাতে শীঘ্র হইয়া যায়, সে সম্বন্ধে এক নির্ব্বন্ধ পূর্ণ অনুরোধ ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটী ব্যাপার ঘটিল, যাহার সম্বন্ধে আনারের পিতা বা মীর লতিফ্‌, কেহই কোন কথা জানিতে পারিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্যাপারটী হইতেছে এই। আগরা সহরের সীমান্তে, "পীর মহরমের" সমাধি মন্দির। এ স্থান, হিন্দু মুসলমানের চক্ষে অতি পবিত্র। সমাধি মন্দিরের আশেপাশে বিস্তৃত উদ্যান। মধ্যস্থলে পীর সাহেবের মর্ম্মর নির্ম্মিত বিশাল মসোলিয়াম। প্রতি জুম্মা অর্থাৎ শুক্রবারে অনেকে শিরণী দিতে, মানত করিতে, পীর সাহেবের কবর স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবার উদ্দেশ্যে, এই স্থানে সমবেত হয়।

মাসের প্রথম ও তৃতীয় জুম্মাবার পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দ্বিতীয় ও চতুর্থটী, পরদানশিন রমণীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সেবার চতুর্থ দিনে, পীর সাহেবের জন্ম দিন পড়িয়া যাওয়ায়, জনতাটা একটু বেশী হইয়াছিল।

এই দিনে আনার উন্নিসা, তাহার নিজের ও পিতার মঙ্গল কামনায়, শিরণী দিবার জন্য এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছে। অবশ্য অবস্থার উপযুক্ত যান-বাহন লইয়াই তাহারা আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ছিল, তাহার প্রিয় সঙ্গিনী জুমেলি আর একজন ভৃত্য।

নবাব সুজাবেগ, দ্বিতীয়বার একটু বেশী জেদ করিয়া তাহার পিতাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আনার উন্নিসাকে তিনি তাহা পড়িয়া শুনাইয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া, আনার উন্নিসা, সত্য সত্যই একটা মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিল। কেননা—

একদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য—অপর দিকে ঘোর দারিদ্র। তাহার পিতাও নানাদিক দিয়া ভাবিয়া, এখন তাহাকে নবাবের সহিত বিবাহিত করিতে খুবই ইচ্ছুক। আবার যখনই এই ঐশ্বর্য্যবান নবাবের কথা সে ভাবে, তাহার ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগের কথা চিন্তা করে, তখনই আনারের হৃদয়ের নিভৃতকেন্দ্রে,মীর লতিফের অফুরন্ত ভালবাসা মাখান মুখখানি জাগিয়া উঠে। তাহাতে তাহার সুখৈশ্বর্য্যের সকল বাসনাই ভাসিয়া যায়।

এইরূপ একটা কঠোর সমস্যার মধ্যে পড়িয়া, আনার মনের শান্তি হারাইয়াছিল। মনের কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। এমন কি, যে জুমেলির কাছে সে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই গোপন করে নাই, তাহাকেও সে এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না।

এই পবিত্র জুম্মাবারে, পীর-মহরমে সিরণী দিবার জন্য সে জুমেলিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। সে দিনটি রমণীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং সকল অবস্থার মহিলাগণই সে ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। আমীর ওমরাহ, ধনী দরিদ্র, সকল শ্রেণীর নারীগণ সেই উদ্যানের নানাস্থানে ঘুরিতেছেন।

জুমেলি, ও আনার, দুইজনে এক ক্ষুদ্র প্রস্তরাসনে বসিয়া সেই অগণিত জনস্রোত দেখিতেছে। কেহ বা আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, আবার কেহবা সেই ক্ষুদ্র মেলার কোন বিপণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিনিস পত্র কিনিতেছে।

জুমেলি কিয়ৎক্ষণ আনারের পার্শ্বে স্থিরভাবে বসিয়া গল্প

করিবার পর বলিল—"তোমার পিতা মীনার কাজ করা পাথরের বাসন বড় ভাল বাসেন। মেলা হইতে সুধু হাতে আমরা বাড়ী ফিরিয়া যাইব? তাঁহার জন্য একটা কিছু লইয়া যাইব না? আমার কাছে টাকা আছে। আমি তাঁর জন্য কোন কিছু কিনিয়া আনি। তুমি এইখানে একটু বোস—ভিড়ে কোথাও যাইও না। তাহা হইলে আমাকে খুঁজিয়া মরিতে হইবে।"

আনারও তাই চাই। একটু নির্জ্জনে ভাবিতে পাইলে, সে যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে। কাজেই সে জুমেলিকে কোনরূপ বাধা দিল না। জুমেলি নিজের কাজে চলিয়া গেল।

একটু দূরে এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া একজন যে আনারকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছিল, আনারউন্নিসা তাহা দেখিতে পায় নাই। জুমেলি চলিয়া গেলে, সে আনারের কাছে আসিল।

আনার উন্নিসা এতক্ষণ চিন্তামগ্ন অবস্থায় থাকার জন্য, এই আগন্তুক রমণীকে দেখিতে পায় নাই। সহসা মুখ ফিরাইবা-মাত্র সে দেখিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক পরমা সুন্দরী সুবেশা, বিচিত্র সাঁচ্চাখচিত ওড়না বিশোভিতা, হাস্যমুখী এক রমণী।

আনার একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। সে মনে ভাবিল—হয় তো এই যুবতী কোনও ধনী ওমরাহের কন্যা।

আনার উন্নিসাকে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

থাকিতে দেখিয়া, সেই সুন্দরী মৃদুহাস্যের সহিত বীণানিন্দিত স্বরে বলিল—"কি দেখিতেছ একদৃষ্টে তুমি বহিন্!"

আনার স্বপ্নোত্থিতের মত একটু চমকিত হইয়া, বলিয়া ফেলিল—"তোমার ঐ ভুবন মোহন রূপ!"

সেই রমণী আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা বাহারবানু।

রূপসী বাহারবানু সহাস্যমুখে সুমিষ্ট স্বরে বলিল—"তোমার চেয়েও না কি আমার রূপ বেশী? তুমি বোধ হয় দর্পণে মুখ দেখ না, তাহা হইলে হয় তো একথা বলিতে না—বহিন্।"

বাহার, আনারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এখন অনুরুদ্ধ না হইয়াও তাহার কাছে বসিল। বসিয়া বলিল—"আনারউন্নিসা! সত্য বল—তুমি কি ভাবিতেছিলে? নবাব সুজা বেগের কথা কি?"

সহসা এই অপরিচিতার মুখে, ভিতরের গুহ্য কথা ব্যক্ত হইতে দেখিয়া, আনারউন্নিসা—বিস্ময়বিহ্বল মুখে একবার মাত্র বাহারবানুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, ব্যগ্রভাবে বলিল—"কে তুমি? এসব কথা জানিলে কিরূপে? আমি যে আনারউন্নিসা এ কথাই বা তোমায় কে বলিল?"

শয়তানী বাহার, একখানি চিত্র তাহার বক্ষবসনের মধ্য হইতে বাহির করিয়া বলিল—"চিনিতে পার কি—এ প্রতিকৃতি কার?"

আনার সে তস্বীর দেখিবা মাত্রই চিনিল। সুজাবেগের মাতা

রুকিনা বেগম, এখানি তাহার পিতার নিকট হইতে লইয়া যান। এ চিত্রের অঙ্কন কর্ত্তা—স্বয়ং মীর লতিফ্। কেন না সেই ছবির নীচে তাঁহার নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত আছে।

মীরলতিফ যে কেবল সৈনিক ব্রতেই সুদক্ষ, তাহা নহে। সুকুমার শিল্পের প্রতি তাহার খুব একটা অনুরাগ থাকায়, আনার উন্নিসার, কিশোরের ও যৌবনের দুইখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছিল। এ ছবি খানি তাহারই অন্যতম।

আনার এই ঘটনায় আরও বিস্মিত হইয়া বলিল—"এই তস্‌বীর তুমি কোথায় পাইলে?"

বাহারবানু—একট দর্পের সহিত বলিল—"স্বয়ং নবাব-উল্‌-মুলুক সুজাউদ্দৌলা আমাকে এ তসবীর উপহার দিয়াছেন।"

আনার। কারণ কি?

বাহার। সে কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই। তুমি তাহাতে অনর্থক মন বেদনা পাইবে। তোমার সহিত আমার কোনই মনোমালিন্য নাই। সুতরাং সে কথা বলিয়া আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই না।

আনার। না—আমার কোন কষ্টই বোধ হইবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।

বাহার বলিল—"একটু পরে তাহা বলিতেছি। সত্য বল দেখি, সুজাবেগকে তুমি পছন্দ কর কি না?"

আনার। নবাব সুজা বেগের সহিত আমার বিবাহ প্রস্তাব হইয়াছে। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া, বা না হওয়া, আমার

পিতার ইচ্ছার অধীন। ইহাতে আমার কোন স্বাধীনতাই নাই। আমার পিতা এখনও বর্ত্তমান। তবে আমার স্বাধীন ইচ্ছা, তাঁর অন্যায় কার্য্যে বাধা দিতে অবশ্য খুবই সক্ষম।

বাহার। ভাল—শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমার ঐ ক্রোধদীপ্ত নেত্র, বলিবার ভঙ্গী, আমায় বুঝাইয়া দিতেছে, তুমি মনের কথা গোপন করিতেছে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? তুমি বন্ধুভাবে আমার সে কথাটি লইবে কি?

আনার। কি কথা!

বাহার। যদি তোমার স্বাধীন অব্যাহত ইচ্ছাই এই বিবাহ ব্যাপার নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হয়, যদি তোমার পিতার ইহাতে প্রকৃত হাত না থাকে, তাহা হইলে আমার অনুরোধ, আমার পরামর্শ এই, যে তুমি নবাব সুজা বেগকে কোন মতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইও না।

আনার। কেন? তাহাতে তোমার স্বার্থ কি?

বাহার। স্বার্থ যে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে আমি যেমন নবাবকে বুঝিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া, এখন অনুতাপে জ্বলিয়া মরিতেছি—যাহাতে তোমার মত নিরীহা অবলাকে সেই যন্ত্রণাটা ভোগ করিতে না হয়—সেই কলুষিত চরিত্র শঠের ছলনায় পড়িয়া, ঐশ্বর্য্যের মোহে ভুলিয়া, তোমারও সর্ব্বনাশ না হয়, সেই জন্যই আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছি। সাবধান! আনারউন্নিসা! ঐশ্বর্য্য প্রলোভনের উজ্জ্বলবহ্নিমুখে, মুগ্ধা পতঙ্গীর মত পড়িয়া আত্মনাশ করিও না।

আনার এ কথার উত্তরে কি যে বলিবে, তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সে কেবল নির্ব্বাক অবস্থায় বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে, বাহারবানুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরস্বরে বলিল—"তুমি নবাবের কে হও? বিবাহিতা পত্নী?"

বাহারবানু, মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"আমি তাঁর যেই হই না কেন, সে কথা এখন নাই বা জানিলে! এর পর প্রয়োজন ঘটিলে তুমি আমার পরিচয় পাইবে!"

আনারউন্নিসা বলিল—"আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা জানিলে কিরূপে?"

বাহার। তুমি আসিবে বলিয়া আমি আসি নাই। আমিও পীরের নিকট সিরনী দিতে আসিয়াছিলাম। তসবীরে তোমার আকৃতি দেখিয়ছিলাম। সহসা তোমাকে দেখিয়াই চিনিতে আমার কোন কষ্ট হইল না। ওই—তোমার সঙ্গিনী আসিতেছে। আমি চলিলাম। কিন্তু—সাবধান! আনারউন্নিসা! সাবধান!

এই কথা বলিয়া বাহারবানু সহসা সেই জনস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেল। আনারউন্নিসা তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায়, আনারউন্নিসার বুকটা বড়ই দমিয়া পড়িল। কে এই অপরিচিতা সুন্দরী, যে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে সব কথাই জানে, অথচ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সে তাহাকে চোখে দেখে নাই!

তাহার কথোপকথন হইতে যতটুকু বুঝা সম্ভব, তাহা

হইতেই আনারউন্নিসা এইটুকু বুঝিয়া লইল, নবাবের সহিত তাহার বিবাহ সংঘটন যাহাতে না হয়, এই অপূর্ব্ব পরিদৃষ্টা রমণীর মনের ইচ্ছা সেইরূপ। আর সে এটুকুও বুঝিল, যে সে নবাব সুজা বেগের শত্রু বই আর কিছুই নয়!

আনার যখন এইরূপ একটা মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে, তখন জুমেলি আসিয়া সেই স্থানে দেখা দিল।

জুমেলি বলিল—"কার সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছিলে?"

আনার। তুই তা দেখিয়াছিস্ নাকি?

জুমেলি। দেখিয়াছি বই কি? কি বলিতেছিলেন উনি তোমাকে!

আনার প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিল—"এমন কিছুই নয়, বাজে গল্প হইতেছিল!"

জুমেলি একথা বিশ্বাস করিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"যার সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিলে, তার পরিচয় জানিয়াছ কি?

আনার। না। তুই ওকে চিনিস নাকি জুমেলি?

জুমেলি। এর আগে অবশ্য চিনিতাম না। তবে এই মাত্র চিনিয়াছি!

আনার। ওঁর প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিস্?

জুমেলি। নিশ্চয়ই।

আনার। কে উনি?

জুমেলি। উনি বড় যে সে লোক নন। এই আগরা

সহরের বিলাসিনীশ্রেষ্ঠা, নামজাদা গায়িকা, বাহারবানুর নাম শুনিয়াছ ত?

আনার। শুনিয়াছি বই কি?

জুমেলি। উনিই সেই বাহারবানু!

আনার এই কথা শুনিয়া, বিস্মিতনেত্রে জুমিলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাহারবানু! অত রূপ! অত মিষ্ট কথা! তাহা হইলেও ঘোর শয়তানী!"

জুমেলি। কেন?

আনার। ও সব দরের বিলাসিনী নারী, পরের অর্থ শোষণ করা যাদের ব্যবসায়, পরের সর্ব্বনাশে যারা সিদ্ধ হস্ত, তারা কি কখনও ভাল হয়?

জুমেলি এবারও ঠকিল। আনার যে ভিতরের সব কথা গোপন করিয়া, তাহাকে বাজে জবাব দিতেছিল, তাহা সে বুঝিল না। সুতরাং বলিল—"সত্যই তাই।"

আনার। ঐ রূপসী যে সত্যই বাহারবানু, তা তুই জানিলি কিরূপে? তোর ত ভ্রম হইতে পারে।

জুমেলি। কখনই না। তুমি যখন রূপসী বাহারের সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন আমি উহার বাঁদীর সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছিলাম। তোমাকে নিবিষ্টচিত্তে কথোপকথন করিতে দেখিয়া, আমি এখানে আসিলাম না। উহার বাঁদীও উহার জন্য একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছিল।"

আনার ক্ষীণ হাস্যের সহিত বলিল—"যাই হোক্ মেলায়

আসিয়া দুনিয়ার একটা নূতনতর স্ত্রীলোককে দেখিলাম। এখন চল্ তবে বাড়ী যাওয়া যাক্।"

তখন দুইজনে বাহিরে আসিয়া, ভৃত্যকে দিয়া তাহাদের আনীত শকটের সন্ধান করিল। আর তাহাতে উঠিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মীর লতিফের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই একটু দিয়াছি। সে আনারের পিতার এক বন্ধুর পুত্র। বাল্য কাল হইতে পিতৃমাতৃ-হীন। মীর লতিফের মাতার দেহান্ত আগে হয়। মীর লতিফের পিতা, পত্নী বিয়োগের পর মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সময়ে, যৎসামান্য কয়েকশত মুদ্রা, আর দশম বর্ষীয় বালক এই মীর লতিফকে, তাঁহার বন্ধু জামাল খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। আর আনারের পিতা এই বন্ধু পুত্রকে সেই সময় হইতেই পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতেছেন।

মীর লতিফ প্রথমে চিত্র-বিদ্যার দিকে খুবই ঝুঁকিয়াছিল। কিন্তু শেষ কি মনে বুঝিয়া, বাদশাহের সেনাদলে প্রবেশ করে। আর নানা বিষয়ে শৌর্য্য কুশলতা দেখাইয়া, বাদশাহের শরীর রক্ষী সেনা দলের একজন অধিনায়ক হইয়া পড়ে।

এক সময়ে কোন শোভাযাত্রা উপলক্ষে, অসংখ্য জনস্রোতের

মধ্যে, সম্রাট্‌পুত্র দারার অশ্বটী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। সুলতান দারা শেকো, অনেক চেষ্টা করিয়াও অশ্বকে সংযত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে এই মীর লতিফ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শাহাজাদার প্রাণ রক্ষা করে। আর ইহার ফলেই, সে এই শাহাজাদা দারা শেকোর সুপারিসে, সেই একশতী মন্সবদারের পদ লাভ করে।

বাদশাহের শরীর রক্ষী সেনাদলে প্রবেশ করার পর মীর লতিফ, তাহার পিতৃপ্রতিম জামাল খাঁর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাদশাহী নিয়মানুযায়ী, ছাউনাতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

তাহা হইলেও, সুযোগ পাইলেই সে আনার উন্নিসার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিত। বহুক্ষণ থাকিয়া তাহার সঙ্গে গল্পগুজব করিত। তারপর নিজের ছাউনীতে চলিয়া আসিত।

বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে খেলাধূলা ও বসবাস করার জন্য আনার ও মীরলতিফের মধ্যে বড়ই একটা প্রীতির ও স্নেহের বাঁধন পড়িয়াছিল। এইজন্য আনার কোথাও যখন মীর লতিফের গুণের প্রশংসা শুনিত, সে তখন আনন্দে অধীরা হইয়া উঠিত। আবার আনারউন্নিসার রূপের ও গুণের প্রশংসা লতিফের কাণে আসিলে, তাহার প্রাণটি যেন একটা আনন্দময় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়িত।

আনারউন্নিসার মাতা যখন জীবিতা ছিলেন, তখন তিনি প্রায়ই তাঁহার স্বামীকে বলিতেন—"এই মীরলতিফকে আমি

ছেলেবেলা হইকে মানুষ করিয়াছি। উহার উপর আমার পুত্রাধিক স্নেহ জন্মিয়াছে। অমন শান্ত, শিষ্ট, সত্যবাদী সরল প্রাণ, নির্দ্দোষ চরিত্র যুবক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। আমার পুত্র নাই। ঐ এক মাত্র কন্যা। তুমি ঐ মীর লতিফের সহিত আমার আনারের বিবাহ দাও। আমাকে যে কালরোগে ধরিয়াছে, তাহাতে আমি যে বেশী দিন বাঁচিব, এরূপ সম্ভাবনা নাই। বিবাহটী হইলে, মরিবার পূর্ব্বে সুখে মরিতে পারি।"

কিন্তু আনারের পিতা জামালখাঁ, মনে মনে একটা উচ্চ আশা পোষণ করিতেন। কেই বা তাহা না করে? তাঁহার কন্যার রূপের প্রশংসা চারিদিকে। আর এই সময়ে দুই এক জন বড় ওমরাহ্ ও ধনীর বাড়ী হইতে, আনারের বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সুতরাং জামাল খাঁ বড়লোকের দিকেই ঝুঁকিলেন।

আনারের পিতা মনে মনে ভাবিলেন, যদি কোন বড় লোকের বাড়ীতে কোন কারণে আনারের বিবাহ না দিতে পারি, তখন মীর লতিফ ত আছেই। দেখাই যাক্ না, ভবিতব্য আমার কন্যার অদৃষ্টকে কোথায় লইয়া যায়।

কিন্তু তিনি পত্নীকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বলিলেন,—"মীর লতিফ এখন বাদশাহী সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়ে এই বিবাহটা ঘটাইলে, সে সংসারের মায়ায় বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ঘরের ছেলে সে—সেত ঘরেই রহিল। এখন না হৌক, দুই মাস পরেই না হয় বিবাহটা হইবে।"

আনারের মাতা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া আর কিছুই

বলিতে সাহস করিতেন না। এইরূপে আশায় আশায় থাকিয়া, তিনি সেই সংকট রোগে দেহত্যাগ করিলেন।

তারপর নবাব সুজা বেগের মাতা, তাঁহার একমাত্র পুত্রের সহিত, আনার উন্নিসার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া, আত্মীয়তা আরম্ভ করিলেন। আর তিনিও তাঁহার মনের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার পূর্ব্বেই পরলোকের পথিক হইলেন।

নবাব সুজা বেগের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের কথা যে আনার উন্নিসা না জানিত, তাহা নয়। তাঁহার সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীরা, পাছে আনার—বড়লোকের ঘরে পড়ে, এই হিংসায় জ্বলিয়া, আত্মীয়তার ভাণ দেখাইয়া, নবাব সুজা বেগের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিত। অবশ্য সে সব কথা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এ সম্বন্ধে বাকী যে টুকু ছিল, বাহারবানু তাহাতে পূর্ণাহুতি দিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে সে বাহিরে সুজা বেগকে তাঁহার উন্নত অবস্থার অনুরূপ সন্মান দেখাইলেও, অন্তরে অন্তরে তাহাকে সে যেন একটু অশ্রদ্ধা করিত।

জুমেলি সংসারের কাজে ভারি ব্যস্ত। আনারউন্নিসা, তাহার কক্ষ মধ্যে বসিয়া এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া, উদাস ভাবে কত কি ভাবিতেছে।

আনার উন্নিসা তখন মনে মনে ভাবিতেছিল—"মহা সংকটে পড়িয়াছি যে আমি। বিশ্বাস করিয়া কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি না। ভয় হয়, পাছে কেউ উপহাস করে। একদিকে ঐশ্বর্য্য—অপর দিকে অভাব অনাটন। একদিকে

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, মুক্ত প্রাণ, সুখে দুঃখে সমান সমবেদনার উপ-ভোগী, স্নেহভরা হৃদয় মীর লতিফ—যার প্রাণের প্রত্যেক কথাটী প্রত্যেক প্রবৃত্তিটি, আমার অজানিত নয়। আর অপর দিকে, যাহাকে আমি সম্পূর্ণরূপে চিনি না,—যার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, তাও জানি না,—যার চরিত্রবল নাই, চারিদিকে যাহার নৈতিক শিথিলতার শোচনীয় কাহিনী,—যে বাহার বান্ধুর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী, তাহার করে আমার স্নেহময় পিতা, আমাকে সমর্পণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।"

"নিজের স্বাধীন মত, ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, পাছে পিতা আমাকে প্রগলভা বলিয়া ভাবেন, অবাধ্য কন্যা বলিয়া অভিসম্পাত করেন, সেই ভয়ে পিতাকেও ত কিছুই বলিতে পারিতেছি না! হায়! আজ যদি আমার মা থাকিতেন?

এমন সময়ে তাহার পিতা কক্ষ দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন,—"আনার!"

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আনার ত্বরিতগতিতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। জামাল খাঁ, কক্ষের দরোজাটী উত্তমরূপে ভেজা-ইয়া দিয়া, কন্যা যে সোফার উপর বসিয়াছিল, তাহার উপর গিয়া বসিলেন।

আনারউন্নিসা, দেখিল, তাহার পিতার মুখ শুষ্ক। তাহাতে যেন একটা দুশ্চিন্তাজনিত উত্তেজনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আনারউন্নিসা, পিতার সেই মলিন মুখ দেখিয়া বলিল,—"তোমার মুখখানি আজ অত শুক্‌নো কেন বাবা?"

জামাল খাঁ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাহারা বয়স্থা কন্যার বিবাহ ব্যাপার লইয়া, একটা মহা সমস্যার মধ্যে পড়ে, আর তাহার একটা সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে না পারিয়া দিশাহারা, হইয়া যায়, তাহাদের অবস্থা ঠিক আমারই মত হইয়া উঠে।"

আনার, সবিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া, পিতার মনোভাব কতকটা অনুমানে বুঝিয়া বলিল,—"কিসের জন্য তুমি এত ভাবিতেছ পিতা ?"

জামাল খাঁ মলিন মুখে বলিলেন—"তোমার জন্যই ভাবিতেছি মা! তবে এবার খালি তোমার জন্য নয়, আমার নিজের জন্য কিছু বেশী মাত্রায় ভাবিতে হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া জামাল খাঁ, একখানি পত্র আনারের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই পত্রখানি পড়িয়া দেখ, তাহা হইলে আমার মুখ কেন এত মলিন, তাহা আমি স্বমুখে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তুমি বুঝিতে পারিবে।"

আনার পত্রখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পড়িল। পত্রপাঠ শেষ হইলে, তাহার সুন্দর মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদের মত মলিন হইয়া পড়িল।

জামাল খাঁ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেন আমার মুখ এত চিন্তাপূর্ণ, তাহা এখন বুঝিলে কি ?"

আনার। খুব বুঝিয়াছি। কিন্তু বাবা!—

জামাল। এর আর কিন্তু কি মা ?

আনার। কিন্তু দেখিতেছি, এই পত্র লেখকের হৃদয় অতি সংকীর্ণ, অতি অনুদার। আর তুমি এই প্রকৃতির লোককে, তোমার জামাতা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক!

জামাল। না করিলেও ত অন্য উপায় নাই। এক সময়ে নসিবের অনুগ্রহে, ঐশ্বর্য্য যথেষ্টই করিয়াছিলাম। আমিও একজন ছোট দরের আমির-ওমরাহ্ গোছ লোক ছিলাম। এখন বিরূপ নসীব সে ঐশ্বর্য্যের প্রায় সবই কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু সমাজে সম্ভ্রম, ইজ্জতের মূল্য, কাড়িয়া লইতে পারে নাই। একদিন এই ইজ্জত বজায়ের জন্য, আমি রুকিনা বিবির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। উহারা ঋণ দিয়া আমার ইজ্জত বজায় রাখিয়াছিল। এখন আমার সেই ইজ্জত বিপন্ন। তুমি আমার বুদ্ধিমতী কন্যা। পুত্র একটা থাকিলে তাহাকে এরূপ স্থলে যাহা করিতে বলিতাম, তাহা তোমায় করিতে বলিতেছি। পারিবারিক সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া, মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও যে বেশী।

আনার। বলুন—আপনার মনের ইচ্ছা কি? আপনি যা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

জামাল খাঁ, কন্যার মুখের দিকে একবার চাহিবমাত্রই বুঝিলেন, সে মুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। তুমিই আমাকে পরামর্শ দাও,এক্ষেত্রে আমি কি করিব? নবাবের এই কঠোর পত্রের অবজ্ঞাসূচক উত্তর কি করিয়া দিতে হয়, তাহা আমি জানি। কিন্তু যা লইয়া দর্প করিব, সে শক্তি ত আমার

নাই! সুজা বেগ যদি নিরাশ হইয়া আমার নামে প্রাপ্য অর্থের জন্য কাজির দরবারে নালিশবন্দ হয়, তাহা হইলে ইজ্জত যে কেবল জন্মের মত যাইবে তাহা নয়, মাথা রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত আমাদের থাকিবে না মা!"

আনার উন্নিসা গভীর মনোযোগের সহিত পিতার কথাগুলি শুনিয়া বলিল,—"আপনি নবাবকে লিখিয়া পাঠান, এই সপ্তাহের মধ্যেই আপনি আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত। আর আমার বিবাহের কেবলমাত্র যৌতুক, ঐ ঋণপত্র।"

কথাটা আনার উন্নিসা এতটা দৃঢ়তার সহিত বলিল, যে তাহা বলিতে তাহার স্বর একটুও কাঁপিল না, তাহার মুখ ভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না।

জামাল খাঁ, কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া খুবই তৃপ্ত হইলেন। এই কথা গুলি বলিবার সময়, আনার উন্নিসার মনে একটা মহা ঝড় উঠিতেছিল। কিন্তু নারীর স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতার প্রচণ্ড শক্তির সহায়তায়, সে সেই মহা ঝড়টাকে এমন ভাবে চাপিয়া রাখিয়া পিতাকে তাহার মনের কথাগুলি বলিয়াছিল, যে জামাল খাঁ সেই কথা গুলিকেই, তাঁহার কন্যার মনের প্রকৃত ভাব মনে করিয়া, প্রফুল্ল মুখে তাহার কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চেষ্টা করিয়া আনারউন্নিসা তাহার পিতার সম্মুখে হৃদয়ে উত্থিত প্রচণ্ড ঝটিকাবেগকে অনেকটা প্রশমিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু রাত্রের নির্জ্জনতার অবসরে সেই ঝটিকা আবার বলসঞ্চয়

করিল। সে দিন, কোন বিশেষ কারণে জুমিলা সে বাড়ীতে ছিল না। কাজেই সমস্ত রাত্রিটা প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া সে তাহার বুকের বোঝাটা খুবই হাল্‌কা করিয়া লইল। আর রাত্রের মধ্যেই সে সংকল্প স্থির করিল, মীর লতিফের কাল তো আসিবার কথা আছে। সে আসিলে, আমার সহিত তাহার ভালবাসার দেনা পাওনা নিকাশের কর্ত্তব্য যাহা—তাহাই করিব।

নবম পরিচ্ছেদ

নবাব সুজা বেগের শেষ পত্রখানি হইতেই, এই মহাঝড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পত্রের ব্যাপারটা কি, আমাদের একটু খুলিয়া বলিতে হইবে।

জামাল খাঁ, নিজে একজন রত্নব্যবসায়ী। তাঁহার সময় যখন ভাল ছিল, তখন তিনি এই ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা উপায় করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাসাদ তুল্য বর্ত্তমান বাড়ীখানি, গৃহের সাজসজ্জা, সবই তখনও তাঁহার এক সময়ের উন্নত অবস্থার পরিচয় দিতেছে।

অতিরিক্ত লাভের আশায়, প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের কয়েকখানি বহুমূল্য হীরক, তিনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজাদের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য, দৌলতাবাদে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে, দস্যুদলের কবলগত হওয়ায়, তাঁহার বহুমূল্য

রত্নগুলি লুণ্ঠিত হয়—তবে কোন গতিকে তাঁহার প্রাণটা বাঁচিয়া যায়। তিনি বহুদিন পরে, বহু কষ্টে, রুগ্ন ও ভগ্ন দেহে বিষণ্ণ মনে, আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কথা এই, যে দস্যু-লুণ্ঠিত পণ্য মধ্যে কয়খানি বহুমূল্য হীরক, তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে। তাহার মধ্যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মধ্যে গণ্য, আরও দুইজন মহাজনের কয়েকখানি হীরা ছিল। তিনিই তাঁহাদিগকে অধিক লাভের প্রলোভন দেখাইয়া, এই হীরা গুলি লইয়া গিয়াছিলেন।

ফিরিয়া আসিবার পর, মহাজনেরা, হীরা বিক্রয়ের ফলাফল কি হইল, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল। তিনি পীড়িত ও শয্যাগত, সুতরাং কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। এই সঙ্গে মহাজনদের মনেও একটা সন্দেহের ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

জামাল খাঁ রোগ মুক্ত হইবার পর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন মানুষকে আশ্রয় করে, তখন তাঁহার সত্য কথাও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই কয়জন পাওনাদার মহাজন, তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না। বরঞ্চ রাজদ্বারে তাঁহার নামে অভিযোগ আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন ক্রমেই তিনি তাহাদের শান্ত করিতে পারিলেন না।

ইমানদার যে, তার পক্ষে ইজ্জত বড় বালাই। যাহারা চিরদিনই এই ইমানদারীর গৌরব রাখিয়া আসিয়াছে, তাহারা ঠিক

বুঝিতে পারে, বেইজ্জত হইবার অবস্থা আসিলে, মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবাব সুজা বেগের মাতা রুকিনা বিবি, তাঁহার দুর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। তিনি এই রুকিনা বিবির নিকট হইতে অনেক চেষ্টায়, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, বিদ্রোহী বন্ধু মহাজনদের দিয়া ইজ্জত রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য, এই টাকার জন্য রুকিনা বিবিকে এক তমস্সুখ লিখিয়া দিতে হয়।

জামাল খাঁ, নবাব সুজা বেগের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"তোমার মাতার মৃত্যুর পর, তুমি আর কোন চেষ্টা না করায় ও অরক্ষণীয়া কন্যা বেশী দিন রাখিতে অক্ষম হওয়ায়, আমি মীর লতিফের সহিত আনারের বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ পাকা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। আমার ও আমার কন্যার মহা দূর্ভাগ্য, যে তোমার সহিত কুটুম্বিতা করা, আমাদের সহিল না।"

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবাব সুজা বেগ বড়ই নির্ব্বন্ধবান। এই আনারকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে, বাহারবান্থুর কবল হইতে তিনি অতি সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু কোথাকার কে এক পথের ভিক্ষুক মীর লতিফ আসিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে দাঁড়াইয়াছে, ইহা ভাবিয়া, তিনি মহাক্ষুব্ধ হইয়া জামাল খাঁকে লিখিলেন,—"কন্যাদানের স্বাধীনতা, সম্পূর্ণরূপে আপনার। যদি এ স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করেন, জানিবেন, আমি এবং আমার মাতা এতদিন আপনার উপর যে

সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তাহা আর করিব না। আমাদের পাওনা টাকা আপনার ভিটা বেচিয়াও আদায় করিতে বাধ্য হইব।"

এই পত্র পাইয়াই জামাল খাঁ খুবই বিচলিত হইয়া পড়েন। এই ঐশ্বর্য্যশালী নবাব সুজা বেগ যে কতটা হীন প্রকৃতির লোক, তাহাও তিনি বুঝিলেন।

সুজা খাঁর নষ্ট চরিত্র সম্বন্ধীয় কথাগুলি যে জামাল খাঁর একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নয়। লোকের সহিত সুজা খাঁর বাহিরের ব্যবহারটা খুব লেফাফা দুরস্ত। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী, আর তাঁর চেয়ে যাঁরা একটু অবস্থাহীন, তাঁহাদের প্রতি এমন একটা অমায়িকতার ভাব তিনি দেখাইতেন—যেন ঐশ্বর্য্যজনিত কোন দম্ভ বা অভিমান তাঁহার নাই।

জামাল খাঁর একমাত্র কন্যা এই আনার উন্নিসা। এই আনার উন্নিসাকে তিনি এক দুষ্কৃতাচারীর হস্তে সমর্পণ করিতে নিতান্তই নারাজ। সুজা খাঁর রূঢ় পত্রখানি পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অন্ততঃ তাঁহার মনের এরূপ একটা দৃঢ়তা ছিল। পরলোকগত পত্নীর অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিতে, তিনি খুবই উৎসুক ছিলেন।

কিন্তু এই পত্রখানি-পাওয়ার পর হইতে তাহার মন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ভাসিয়া গেল। পত্নীর নিকট তাঁহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বের সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি, মীরলতিফের কৃতোপ কাজের কৃতজ্ঞতা, সবই তিনি ভুলিয়া গেলেন। প্রচণ্ড স্রোততরঙ্গ মধ্যে সহসা নিমজ্জিত ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য, যেমন তৃণখণ্ডকেও

আশ্রয় মনে করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে, জামাল খাঁ,তাঁহার ইজ্জত রক্ষার জন্য, সেইরূপ আনারকে সুজাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অন্তরমধ্যস্থ এক গুপ্তবাণী যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল—"তোমার কন্যার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা লঙ্ঘন করাইবার তুমি কে ? তাহার পরিবর্ত্তনের শক্তি তোমার কই ? বিধাতা যার সঙ্গে যার মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—সে ব্যবস্থার রদ করিতে পার, এমন ক্ষমতাই বা কই তোমার ? কত লোকে চেষ্টা চরিত্র করিয়া বড়লোকের বাটীতে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য, কতই না প্রয়াস পায়। বিনা চেষ্টায় যদি এই প্রয়াসফল তোমার হস্তগত হয়, মূর্খের মত তাহা ছাড়িয়া দিতেছ কেন ? নবাব সুজাখাঁর মত শক্তিশালী লোকের সহিত শত্রুতা ঘটিলে তোমার মান ইজ্জত সবই নষ্ট হইবে। সত্য বটে, সুজাখাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নহে। কিন্তু পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণীর শক্তি যে কত বেশী, তাহা ত তুমি ভাব নাই ? হয়তঃ তুমিই একদিন দেখিবে,এই দুশ্চরিত্র নবাব--তোমার কন্যার অক্লান্ত যত্নে চেষ্টায় ও শক্তিতে দেবচরিত্র হইয়া উঠিয়াছে।"

অন্তর্বাণীর এই সব কথায়, জামালখাঁর প্রাণের বোঝাটা খুবই কমিয়া গেল। একটু আগেই তিনি ভাবিতেছিলেন, কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি তাহাকে অপাত্রে সমর্পণ করিয়া বড়ই একটা অন্যায় কাজ করিতেছেন। কিন্তু এই ভাবের চিন্তায় বিবেকের সে তীক্ষ্ণ দংশন জ্বালাটা যেন খুবই কমিয়া গেল।

বলা বাহুল্য—হতভাগ্য মীর লতিফের সহিত প্রতিশ্রুতির কথাটা, তিনি তাঁহার চিত্ত হইতে একাবারে মুছিয়া ফেলিলেন। খালি তাই নয়, সেই দিনই তিনি—ছাউনীতে মীর লতিফের সহিত দেখা করিয়া, তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। আর এটুকুও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে আনারের সহিত যখন নবাব সুজা বেগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার সহিত এখন অত ঘন ঘন দেখা করাটা তার পক্ষে সুযুক্তিকর নহে।

মীর লতিকের বুকে, প্রচণ্ড শেলের মত এই সাংঘাতিক কথাগুলি আঘাত করিল। এই আঘাতে তাহার হৃদয় শতধা বিচ্ছিন্ন হইল। সে যে ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নের একটা উজ্জ্বল দীপ্তিতে মোহিত হইয়া, সংসারের বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সেই দীপ্তিটা যেন সহসা নিভিয়া গেল। সে দেখিল—তাঁহার অন্তরে, বাহিরে, সূচীভেদ্য প্রলয়ের অন্ধকার।

আর মীর লতিফের সহিত সাক্ষাত সময়ে তাহার সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আনারউন্নিসার পিতা, তাহার সকল গুলিই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, কন্যার নিকট ব্যক্ত করিলেন। আর এটুকুও তাঁহার কন্যাকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, যে এতবড় কথাটা শুনিয়াও মীর লতিফ্ একটুও বিচলিত হয় নাই! বরঞ্চ সে এ সংবাদে যেন খুবই আহ্লাদিত হইয়াছে।

নবাব সুজা বেগের সহিত কন্যার বিবাহটা দিয়া ফেলিতে পারিলেই, তিনি একটা লজ্জাঙ্কর হীন ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ

করিতে পারিবেন, এতজ্জনিত একটা আনন্দ উচ্ছাসে অধীর হইয়া, পর দিনই তিনি নবাব সুজা বেগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও স্থির হইয়া গেল, যে বিবাহের দিনই নবাব ঋণপত্রখানি তাঁহাকে ফেরৎ দিবেন।

আর এতটা আত্মসমর্পণ, এতটা আনুরক্তি, এতটা আত্মীয়তা, এতটা স্নেহ, যে দুনিয়ার ঘটনা স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, একাবারে তৃণখণ্ডের মত শতধা চূর্ণ হইয়া ভাসিয়া যাইতে পারে, হতভাগ্য মীর লতিফ্ কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ঋণঘটিত এই বাধ্য বাধকতার জন্যই যে এই বিবাহে জামালখাঁকে মত দিতে হইয়াছে, ইহাও সে বুঝিল। সে মনে মনে ভাবিল—"হায়! আজ আমার যদি এ অর্থটা থাকিত?"

সহিষ্ণুতা, মীর লতিফের স্বভাবগত। বাল্যকাল হইতে দুঃখের ক্রোড়ে যারা লালিত পালিত হয়, সহিষ্ণুতাটা তাহারা খুবই আয়ত্ত করিয়া রাখে।

এজন্য যখন সে জামালখাঁর নিকট এই সংবাদ প্রথমে শুনিল, তখন সে সাহসও সহিষ্ণুতা সঞ্চয়ে, মনটাকে তাহার শক্তির অধীন করিয়া ফেলিল। আর এই শক্তির প্রভাব এতটা বেশী, যে জামালখাঁ, অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াও তাহার মুখভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। এই জন্যই জামাল খাঁর মনে একটা সংস্কার জন্মিল, যে এই বিবাহ ব্যাপারে সে একটুও বিস্মিত নহে। আর এই কারণেই জামাল খাঁ

তাঁহার কন্যাকে বলিয়াছিলেন মীরলতিফ্‌ এ ব্যাপারে একটুও দুঃখিত হয় নাই।

দুর্ভাগ্য মীরলতিফ মনে মনে নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিল—যখন আনারকে পাইবার সকল আশাই অতল কালস্রোতে ভাসিয়া গেল, তখন আগরা ত্যাগ করিয়া এই প্রলোভনের মুখ হইতে দূরে থাকাই ভাল।

ইতিপূর্ব্বে সে আনারউন্নিসাকে যখন অন্যস্থানে তাহার বদলী হইবার কথাটা বলে, তখন আনারউন্নিসা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। আর লতিফও আনারের মলিন মুখ দেখিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, চেষ্টা করিলে এ স্থান পরিবর্ত্তনের আদেশ বন্ধ করান যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দুই চারি দিন পরেই এই ব্যাপার ঘটায়, সে তাহা রদ্‌ করাইবার কোন চেষ্টাই করিল না। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, যে প্রলোভনের পথ ত্যাগ করিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ জগতে দুইজন লতিফের আপনার জন ছিলেন। এক আনারের পিতা, জামালখাঁ ও দ্বিতীয় ব্যক্তি জুম্মাশা ফকির।

এই জুম্মাশা, তখন দিল্লী আগরার সর্ব্বজন জানিত ব্যক্তি। সম্রাট শাহজাহান, তাঁহাকে বড়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সাধারণ লোকে, তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিত। পূর্ব্বোক্ত

পীর-মহরমের আস্তানার অতি নিকটে, এক নির্জ্জন মস্‌জিদের মধ্যে এই মহাত্মা ফকির জুম্মাশা, তাঁহার ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন।

তাঁহার বয়স কত, তাহা কেউ ঠিক বলিতে পারে না। তাঁহার শুভ্র কেশ, সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুরাজি, গলদেশে নীল বর্ণের তবলকির মালা এবং পরিধানে সুনীল বসন। মুখে যেন তখনও যৌবনের লাবণ্য তেজ ও প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। অতি প্রাচীনেরা অনুমান করেন, তাঁহার বয়স, আশী বৎসরের উপর হইবে।

সংসার বিরাগী—এই জুম্মাশার, সকল জীবের উপর সমান দয়া। সকল ধর্ম্মের লোককেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। হিন্দুও মুসলমান সবই তাঁহার চক্ষে এক। আর্ত্তের উপকার, পীড়িতের সেবা, অনাথকে আশ্রয় দান, অনাহারীকে আহার প্রদান, তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্য। তাঁহার অতিথিশালার উন্মুক্ত ভাণ্ডার, এই "পীর মহরমের" সীমার মধ্যেই ছিল। তিনি নিজে অবশ্য সকল সময়ে এই সমস্ত দরিদ্র লোকের সেবাব্রতে নিযুক্ত থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার অনুগত শিষ্যবর্গের মধ্যে এক একজনের উপর তিনি এক একটী নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। আর নিজে প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া পীরমহরমে উপস্থিত হইতেন। এই সময়েই লোকে তাঁহার দর্শন পাইত।

এই সন্ন্যাসী জুম্মাশার একজন অনুগৃহীত ও কৃপাপ্রার্থী শিষ্য

আনারউন্নিসার পিতা জামাল খাঁ। এই জন্য তিনি আনারউন্নিসা ও মীর লতিফের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত।

যে সকল ধনী ও অভিজাতবর্গ, তাঁহার সদাব্রতের ও লোক সেবার কার্য্যে অর্থসাহায্য করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে এই জামাল খাঁও অবশ্য একজন। যখন জামাল খাঁ রত্ন ব্যবসায়ে দুই পয়সা উপায় করিতেন, তখন সাধ্যমত তিনি জুম্মাশাকে বেশী ভাবে অর্থসাহায্য করিতেন। অথচ জামাল খাঁর অপেক্ষা যাঁহাদের অবস্থা আরও উন্নত, তাঁহারা সেরূপভাবে প্রাণ খুলিয়া সৎকার্য্যে দান করিতে পারিতেন না।

এদানীং জামালখাঁর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকে যাইতে-ছিল। তাহাহইলেও তিনি পীর-মহরমে জুম্মাশার সদাব্রতের বৃত্তিটা, তখনকার অবস্থানুরূপ ভাবেই দিয়া আসিতেছিলেন।

একবার আনারের ভাগ্য গণনা করাইতে গিয়া, জামালখাঁ এই জুম্মাশার নিকট হইতে জানিতে পারেন, তাঁহার কন্যার অর্থ ভাগ্য খুব বেশী। সম্ভবতঃ নিশ্চয়ই সে কোন বড়লোকের ঘরে পড়িবে।

এই কথা শুনিবার পর হইতেই, জামালখাঁ একটা দুরাশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তৎপরে যখন, নবাব সুজা বেগের সহিত আনারের বিবাহ প্রস্তাব আসিল, তখন জামালখাঁ জুম্মাশা ফকিরের ভবিষ্যৎ বাণীর উপর খুবই আস্থাবান হইয়া পড়িলেন।

এই জুম্মাশা সম্বন্ধে যে আমরা এত কথা বলিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। এই উপন্যাসের সহিত পাঠক যতই

অগ্রসর হইবেন, ততই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

যেদিন মীর লতিফের নিকট, জামাল খাঁ আনারের বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন, তাহার দুই এক দিন পরে মীর লতিফ, পীর মহরমে আসিয়া জুম্মাশার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

মীর লতিফের সৌভাগ্য, যে সে দিন অন্য কোন দর্শনার্থী ফকির-সাহেবের কক্ষে ছিল না। সুতরাং নির্জ্জনে পাইয়া সে আনারের সহিত তাহার বিবাহভঙ্গ সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জুম্মাশাকে জানাইল।

এই সুন্দরদর্শন মিষ্টভাষী সুচরিত্র যুবক মীরলতিফ্‌কে জুম্মাশা একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। লতিফের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তারপর মিষ্ট স্বরে মীর লতিফ্‌কে বলিলেন—"আনার যে কোন ধনবানের গৃহিণী হইবে, বহু পূর্ব্বে আমি তাহা জামালখাঁকে আভাস দিয়াছিলাম। বিধিলিপি—চিরদিনই অখণ্ডনীয়! এখন তোমার মনের সংকল্প কি—লতিফ্‌?"

মীর লতিফ, জুম্মাশার মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া আবার মুখ নত করিল। তাঁহার সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সে যেন সহ্য করিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল—"আমি এখন আগরা ত্যাগ করিয়া দূর দেশে যাইতে চাই।"

জুম্মাশা প্রসন্নবদনে বলিলেন—"তোমার এ সংকল্প শুভ, কেন না প্রলোভনের মুখ হইতে দূরে থাকাই ভাল। ত্যাগে মহত্ত্ব—ভোগে

নয়। নিবৃত্তিই—শ্রেষ্ঠ মার্গ। প্রবৃত্তিই সকল কষ্টের মূল। তুমি একজন বীর সেনানী। সংকট যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার অসীম-সাহসিকতার কথা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আত্ম-ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণ করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতই বীর আখ্যা পাইবার যোগ্য।"

মীর লতিফ বিমর্ষ মুখে বলিল—"তাহা হইলে কি আমাকে এ ব্যাপারে সকল আশাই ত্যাগ করিতে আপনি পরামর্শ দেন ?"

জুম্মাশা। নিশ্চয়ই তাই। যাহা প্রাক্তনে নাই, তাহার সম্বন্ধে চেষ্টা করা যেন ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর অতি ব্যর্থ হস্তক্ষেপ!

মীর লতিফ। সত্যই তাই বটে! কিন্তু—

জুম্মাশা। তোমার 'কিন্তুর' মানে হইতেছে অতীতের স্মৃতি! কিন্তু মানে—এতদিনের মায়া। কিন্তু মানে—আবাল্য সাহচর্য্য-জনিত এই মায়ার আকর্ষণের বিলোপ জন্য—একটা কষ্ট। কিন্তু বৎস! চিত্তবল প্রবল হইলে এ সব মোহ ত সহজেই কাটানো যায়। চেষ্টা করিলে অবাধ্য ও দুর্ব্বল চিত্তবৃত্তিকেও সবল করা যায়। তুমি চেষ্টা কর। নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে। খোদা তোমার প্রাণে শক্তি আনিয়া দিবেন। সেই শক্তি তোমায় সবই ভুলাইয়া দিবে। অতীতের স্মৃতি জন্মের মত নষ্ট হইবে।

মীর লতিফ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, বিমর্ষমুখে বলিল—"ভাল! আপনার আদেশই আমি পালন করিব। কিন্তু—এই এই আগরা সহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, আনারউন্নিসার সহিত

একবার গোপনে সাক্ষাৎ করায় কি কোন পাপ আছে প্রভু ?”

জুম্মাশা। তুমি আগরা ত্যাগ করিয়াই বা যাইবে কেন? অসংখ্য প্রলোভনের সম্মুখে থাকিয়া প্রবৃত্তি দমন করার অপেক্ষা, বোধ হয় বেশী গৌরবজনক কিছুই ত নয় মীর লতিফ !”

মীর লতিফ মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিল, ফকির জুম্মাশা যাহা বলিতেছেন,—তাহাই ঠিক। কিন্তু সে তাহার নিজের চিত্তের উপর ততটা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সুতরাং সে বলিল—“প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহাতে জয়লাভ করিতে পারি, প্রথমে তাহার চেষ্টা করিব। যদি না পারি, অগত্যা আমায় বাধ্য হইয়া এই আগরা হইতে চির বিদায় লইতে হইবে।”

এই কথা বলিয়া মীর লতিফ্ জুম্মাশার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইল বটে, কিন্তু আগরা ত্যাগের সংকল্পটা সে তাহার মন হইতে মুছিল না। কেন না —চিত্ত তাহার বড়ই অবাধ্য।

ভালবাসা এই জিনিষটা, বিরহের প্রথম সূচনায় যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, তাহার পরিমাণটা যেন তাহার ভালবাসার পাত্রকে একটু বেশী করিয়া জানাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। এই হতভাগ্য ও নিরাশচিত্ত মীর লতিফের তাহাই হইল।

সে তাহার আবাস স্থানে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেখান হইতে যেন সকল সৌন্দর্য্য ঝরিয়া গিয়াছে। যেখানে থাকিয়া,

ভাবী মিলনের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, সে ধরাকে খুবই সুষমাময় দেখিত, সেদিন সেইখানে থাকিয়াই বুঝিল, জ্যোৎস্না-লোকে হাস্যময়ী মেদিনীর বুক হইতে, যেন সকল শোভাই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার চারিপাশে উষ্ণ নিশ্বাস বহিতেছে।

লতিফ, সে দিন দেখিল, জ্যোৎস্নার সে শুভ্রজ্যোতিঃ নাই—ধীরে প্রবাহিত নৈশবায়ুতে সে স্নিগ্ধতা নাই। নৈশ সমীরণবাহিত পুষ্পবাসে সে সুগন্ধ নাই। সেনানিবাসের পার্শ্ববাহিনী যমুনার কল সঙ্গীতে যেন সে মধুর মিলনের সুরনিক্কণ নাই! হায়! কেন এমন হইল?

সে বিষণ্ণ প্রকৃতির উপর বিরক্ত হইয়া, শয্যায় শুইল। হায়! সে শয্যাও যেন সুতীক্ষ্ণ কণ্টকময়। সে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাতায়ন পার্শ্বে আসিল। বোধ হইল, যেন তাহার পায়ের নীচের মেঝেটা ধীরে কাঁপিতেছে। সে সেই চন্দ্রালোকিত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া, এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণের যন্ত্রণা না কমিয়া যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—কিসে এ জ্বালা হইতে সে শান্তি পাইবে! সে বুঝিল এই অভিশপ্ত আগরায় থাকিলে শান্তির আশা যে অতি দুষ্কর।

গভীর মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া, সেই গভীর রাত্রে নিজের কক্ষ ত্যাগ করিয়া, সেনানিবাসের পার্শ্ববাহিনী যমুনার তীরে সে আসিল। নদীতীরে একটী প্রস্তরমণ্ডিত ক্ষুদ্র ঘাট। সে সেই

ঘাটের সোপানের উপর বসিয়া—একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায়! কেন এমন হয়?"

চঞ্চল তরঙ্গময়ী যমুনা, কল কল-ছল-ছল শব্দে—উজান তুলিয়া চলিয়াছে। নীল জলের উপর, গলিত রৌপ্যের মত চন্দ্র-কিরণ ধারা। স্নিগ্ধ মলয়—যমুনার শীকরকণা অপহরণ করিয়া আনিয়া, তাহাকে মৃদুব্যজন করিতে লাগিল। কিন্তু কই তাহাতেও ত তাহার হৃদয়ের উষ্মা যাইতেছে না।

সে যেন শুনিল—যমুনার কলকল ছলছল শব্দ তাহাকে বলিতেছে, "ছিঃ—ছিঃ—এত লঘু তুমি?" সেই নৈশসমীরণ মৃদু গর্জ্জনে বলিতেছে—"ছিঃ—ছিঃ এত অসার তুমি!" সেই শুভ্র জ্যোৎস্না যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে—"নিজের স্বার্থই কি তোমার এত বেশী! যাহাকে তুমি ভালবাস—তাহার স্বার্থ দেখিতে কি তুমি একাবারে অন্ধ। চলিয়া যাও লতিফ্! সুদূর প্রবাসে। আর এখানে থাকিও না। যাহাকে ভালবাস, তাহার সুখের পথ কণ্টকিত করিও না।"

নীরবভাষায় জড় প্রকৃতির এই শ্লেষময় তীব্র তিরস্কার, যেন তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অতি শোচনীয় লজ্জাআনিয়া দিল। মীর লতিফ অস্ফুট স্বরে বলিল—এই ভাষাহীনা প্রকৃতি দেবী ঈঙ্গিতে আমাকে যে সঙ্কেত করিতেছেন, তাহাই ত ঠিক। জুম্মাশা ত আমাকে আভাসে ঈঙ্গিতে এই কথাই বলিয়াছিলেন।

তারপর সে মনে মনে নিম্নলিখিত ভাবে, প্রশ্নোত্তর ছলে এই যন্ত্রণাময় ব্যাপারটা লইয়া একটু আলোচনা আরম্ভ করিল।

প্রথমে সে প্রশ্ন করিল,—"এই আনারউন্নিসা আমার কে ?"

উত্তর আসিল,—"সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা সে। এতদিন সে সোদর জ্ঞানে, তোমায় ভাল বাসিয়া আসিয়াছে। বাল্য ও কিশোরের চঞ্চল প্রেমের কথা তুমি ভুলিয়া যাও। জান তো—আনারের সহিত এক সম্ভ্রান্ত ওমরাহের বিবাহের কথা হইতেছে। তাহার সৌভাগ্যের পথে দাঁড়াইও না। তাহার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভাগ্যকে, তোমার মর্ম্মভেদী নিরাশার মলিন নিশ্বাসে কলুষিত করিও না। ভালবাসা—ঈশ্বরের দান। সেই প্রেমময়ের পবিত্র প্রেমই, বিভিন্ন পাত্র বিশেষে, বিভিন্ন প্রকারের প্রেম মাধুরীর বিকাশ করে। এ দুনিয়ায় মাতা, পিতা, সুহৃৎ ভগ্নী, পত্নী, সবাইকেই ত লোকে ভালবাসে। যাহারা নিস্বার্থভাবে ভালবাসে, তাহারাই ত ভালবাসিতে জানে। ভালবাসার জন্য যাহারা ভালবাসে, তাহারাই ভালবাসার মহত্বের মর্য্যাদা রাখিতে পারে। যাহা অসম্ভব, তাহার জন্য আশাপূর্ণ হইও না, আশাভঙ্গে ব্যাকুল হইও না। এই না জুম্মাশা তোমায় বুঝাইয়া দিলেন—ত্যাগেই প্রকৃত মহত্ত্ব। আসক্তিতে নয়। অতবড় সাধু যিনি তাঁহার কথা তুমি কি সাহসে অগ্রাহ্য করিতে চাও? হায়! অতি অসার অপদার্থ তুমি!"

"এ বিশ্ব ত চিরদিনই এক মহা সুরে গাঁথা। চিরদিনই ত শুনিয়া আসিতেছ, যেখানে সুখ—সেইখানেই দুঃখ। যেখানে হাসি—সেইখানেই—অশ্রু। যেখানে ভ্রান্তি—সেইখানে সত্য। যেখানে আলোক—সেই খানেই আঁধার।"

"তবে কেন ভ্রমে পড়িয়া কষ্ট পাও ? একটু ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেখ দেখি, তাহাতে তুমি কত আনন্দ পাইবে। একটু স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থের জন্য প্রাণটাকে সমর্পণ করিয়া দেখ দেখি, তাহাতে কি পবিত্র সুখ। কি অনাবিল তৃপ্তি!"

"ছার! তোমার এ রূপমোহ! এই দুনিয়ায় এই আনার উন্নিসাই কি শ্রেষ্ঠ রূপসী ও গুণবতী? এই ধরার বুকে এমন আর কি কেহ নাই, যে আনারের অপেক্ষা তোমায় বেশী ভালবাসিতে পারে?"

"ভুলিয়া যাও—মীর লতিফ! তুমি এই আনারউন্নিসাকে। মনে ভাবিও, যেন কোন সুখনিশায় তুমি একটা সুখস্বপ্ন দেখিয়া অধীর হইয়াছিলে। ভালবাসার জন্য—ভালবাসিতে শিক্ষা কর! আনারের অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তি আনয়নের জন্য যে বিধান করিয়া দিতেছেন, তুমি তাহার সহায়তা কর। তাহার অতি নিকটে সমাগত সৌভাগ্য সম্মুখে, প্রলোভনের মত না থাকিয়া তাহার নেত্রপথ হইতে সুদূর বিস্মৃতির রাজ্যে চলিয়া যাও। এই আত্মত্যাগের মহত্বে আনার যখন জীবনে চিরসুখী হইবে, তখন তুমিই যে আনারকে লাভ করার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইবে!"

এতক্ষণের পর অন্তরস্থ জাগ্রত বাণীর এই সংকেতময় উপদেশে মীর লতিফ্ একটা সোজা পথ দেখিতে পাইল। এতক্ষণ সে এক অন্ধকারময় বন্ধুর পথে বিচরণ করিয়া, প্রতি পদক্ষেপেই যাতনা ভোগ করিতেছিল—কিন্তু এখন সে যেন দেখিল, তাহার

সেই অন্ধকারময় পথ খুব উজ্জ্বল। তাহার কর্ত্তব্য অতি পরিস্ফুট। তাহার আত্মসুখাভিলাষী সংকীর্ণ হৃদয়, যেন মহত্ত্বের জ্যোতি কণায় পরিপূর্ণ। সে এই দীর্ঘ চিন্তার পর বুঝিল—"এই সিদ্ধ ফকির সাধু পুরুষ জুম্মাশা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। ত্যাগেই মহত্ত্ব! স্বার্থ পরিহারেই দেবত্ব!

তখন তাঁহার হৃদয়—মহাঝটিকার পরে বিশাল বারিধির মত অতি শান্ত। তাহা যেন উন্মাদ তরঙ্গের তাণ্ডবলীলা বিহীন। তখন সে হৃদয়ে জ্বালার পরিবর্ত্তে শান্তি, আসঙ্গলিপ্সার পরিবর্ত্তে স্বার্থহীন উদার আনুরক্তি, সংকীর্ণতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতা, আসিয়া দেখা দিয়াছে।

চিন্তাশূন্য, বিপ্লববিহীন শান্তহৃদয়ে, মীর লতিফ্ পুনরায় তাহার কক্ষে ফিরিয়া আসিল। যে শয্যা একটু আগে তাহার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা যেন এখন খুব শীতল ও আরামপ্রদ। কেননা—সে তাহার ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যটি যে, কি, তাহা স্থির করিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু সে সুখ নিদ্রাতেও তাহার নিস্তার নাই। সে স্বপ্নে দেখিল, যেন আনারউন্নিসা তাহার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"ছার আমি! এ জগতে আমার চেয়ে আরও কত সুন্দরী আছে! স্নেহে, মায়ায়, ভালবাসায়, সহানুভূতিতে, অতি নগণ্যা আমি। আমার চেয়ে আরও কত আছে—যাহারা তোমার জন্য জীবন সমর্পণ করিতে পারে। এ রূপ, এ দেহ, ত চিরদিনের জন্য নয়। বাসিফুলের মত একদিন না একদিন ধরণীর বুকে ঝরিয়া পড়িবে।

তখন কোথায় থাকিবে এ তীব্র আকর্ষণ! এ ছলনাময়ী মোহ! এ প্রাণস্পর্শী ব্যাকুলতা! তবে কেন এত চঞ্চল হইতেছ তুমি মীর-লতিফ্?

যেখানে তোমার মন যাইতে চায়, যাও—তুমি সেখানে। যেখানে গিয়া তুমি প্রাণে শান্তি পাইবে, যাও—তুমি সেই দেশে। যেখানে গেলে আমার এ ছার স্মৃতি ভুলিতে পারিবে, যাও—তুমি সেই সুখস্বপ্নময় রাজ্যে! অতি তুচ্ছ! অতি হীনা আমি! রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ যে কত স্বপ্ন দেখে। কেউ সুখের সাগরে ভাসে, কেউ বিরহে কাঁদে,কেউ বা ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মনে ভাবিও, আমাদের প্রথম জীবনের ব্যাপারটাও যেন একটা বিচিত্র কুহেলিমাখা মধুর স্বপ্ন! আর তার শেষে বিরহের প্রচণ্ড অনলজ্বালা।

তবে একটী অনুরোধ তোমাকে লতিফ্! তোমার হৃদয় হইতে আমায় একাবারে মুছিয়া ফেলিও না। স্মৃতি সুখেরও হয়, দুঃখেরও হয়। কিন্তু এই স্মৃতি জিনিষটা ত এক। তুমি তোমার স্মৃতিকে চিরদিনের জন্য সুখময় করিয়া লইও। ভ্রাতৃভাবে—আমার কল্যাণ কামনা করিও। যদি কখনও কোন বিপদে পড়িয়া তোমার সাহায্যপ্রার্থিনী হই, তখন একবার দেখা দিও। মৃত্যু যখন তাহার চিরতুষারময় হস্তখানি আমার দেহে বুলাইয়া দিয়া চিরজন্মের মত অসাড় করিয়া দিবে, তখন একবার আসিয়া চরণধূলি দিও। তুমি যে আমার চক্ষে চির মহত্ত্বময় মীরলতিফ্?

বিধাতার ব্যবস্থায় আর পিতার বিধানে, এখন আমি নবাব

সুজাখাঁর বাগদত্তা পত্নী। তুমি আমার স্নেহময় ভ্রাতারূপে সেই মঙ্গলময় বিধাতার নিকট প্রার্থনা কর, যেন আমি প্রেমময়ী পত্নীরূপে, নূতন জীবনে স্বামীর প্রতি আমার মহাকর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে পারি। আর আমার এই স্মৃতি হইতে অতীতের সমস্ত কথাই চিরজন্মের মত মুছিয়া ফেলিতে পারি।" এই কথা বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টা সেই আনারউন্নিসা, যেন দর্পভরে তাহার শয্যা পার্শ্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

মীরলতিফ্ স্বপ্নঘোরে যেন আনারকে ধরিতে গেল। কিন্তু পারিল না। সেই কক্ষমধ্যে কোথায় যে তাহার সেই তীব্র জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি সহসা বিলয় হইল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না।

সহসা তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে নেত্রমার্জ্জনা করিয়া, নিদ্রার ঘোর কাটাইয়া লইয়া দেখিল—তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। তবে প্রভাতকুসুমের সুগন্ধি পরাগ মাখিয়া, উষার স্নিগ্ধবায়ু তাহার ললাটে, সেই স্বপ্নজনিত উত্তেজনা সঞ্জাত ঘর্ম্ম-বিন্দুকে সযত্নে মুছাইয়া দিতেছে।

লতিফ ভাবিল—"একি বিচিত্র স্বপ্ন! সত্যই কি আনার-উন্নিসা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া আমায় মৃদু তিরস্কার করিয়া গেল! না—না—সবই মিথ্যা! সবই আমার অনুশোচনাময় উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকৃত ক্রিয়া।

তাহা হইলেও, সে আনারকে একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিল। সে পত্রে কোন ক্ষোভ নাই—আক্ষেপ নাই, অনুরোধ নাই, তীব্র তিরস্কার বা বিদ্রূপের লেশ পর্য্যন্ত নাই।

সে পত্রে লেখা ছিল—"স্নেহময়ী আনার! তোমার দাম্পত্যজীবন চিরসুখময় হউক,এই আমার কামনা। আমি মহিমাময় বিধাতার কাছে এই প্রার্থনাই করিতেছি। সম্রাট-পুত্র দারা শেকোর নূতন আদেশে, কালই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাকে আগরা ত্যাগ করিতে হইবে। আজ সন্ধ্যার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল,—কিন্তু বাদশাহের ভৃত্য আমি। সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য আমার নাই। এজন্য রাজ হুকুমে বাধ্য হইয়া সুদূর প্রবাসে চলিলাম।"

রাজকুমার দারাশেফের আদেশ ছিল, "যত শীঘ্র পার আগরা ত্যাগ করিয়া আমার লাহোরের শিবিরে পৌঁছিবে।" মীর লতিফ্ ইচ্ছা করিলে আরও দুই চারি দিন বিলম্ব করিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা করিল না। কেন না জড় প্রকৃতির সেই জ্বালাময় বিদ্রুপ বাণী তখনও সে ভুলে নাই।

আর তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য,ঠিক সময়েই, আনারউন্নিসার নিকট তাহার পত্র খানি পৌঁছাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, মীর লতি-ফের পত্রখানি আনারউন্নিসা জুমেলার কাছে পাইল। পত্রখানি পড়িয়া, তাহার মুখ শুকাইল। সে দেখিল, সে পত্রমধ্যে আগা-গোড়া একটা অস্ফূট মর্ম্ম-বেদনা, অতি করুণ কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনার মুখ তুলিয়া দেখিল জুমেলা সে কক্ষে নাই।

সে মীর লতিফের আগমন প্রত্যাশায় উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। আর তার পরিবর্ত্তে সে পাইল কিনা,তাহার স্বহস্ত লিখিত এক প্রাণহীন, করুণাহীন, সমবেদনা বিহীন, সেই পত্র।

আনারউন্নিসা, চিরদিনই অভিমানিনী। সে মনে মনে ভাবিল, এ পত্র মীর লতিফের মনের ভিতরের কথাই বহন করিতে আনিয়াছে।

তাহার পিতা সে দিন বলিয়াছিলেন,—“নবাবের সহিত তোমার বিবাহের কথা শুনিয়া মীরলতিফ হাঁ কি না ভালমন্দ কিছুই বলিল না। বরঞ্চ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন ইহাতে তিলমাত্র দুঃখবোধ করে নাই।”

মীর লতিফ্ সংযমের ও সহিষ্ণুতার বলে তাহার মুখে যে উদ্বেগহীন ভাবটা আনিয়াছিল, জামাল খাঁ ভ্রান্তিবশে সেটিকে উপেক্ষার ভাব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। আর এই জন্যই তাহার নিজের মনগড়া একটা অভিমতই, তাঁহার কন্যার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আনার উন্নিসার মনে এখন পিতৃকথিত সেই উপেক্ষার কথাটাই খুব জাঁকিয়া বসিল। স্থিরভাবে বিবেচনার শক্তি তাহার ছিল না।

সে বুঝিল,—যে মীর লতিফ এক মুহূর্ত্তের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া পড়িত, আজ সে একবার আমার সহিত দেখা করিবার অবকাশ পাইল না। আমি তাহার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বেই সে নিষ্ঠুরের মত চলিয়া গেল। আমার মনের দুটো দুঃখের কথা না শুনিয়াই, সে সমবেদনার দেনা-পাওনার ব্যাপারটা এই ভাবেই কি রোক শোধ করিয়া দিল? হায়! অকৃতজ্ঞ মীর লতিফ!

মীর লতিফের এই অকৃতজ্ঞতা, তাহার চক্ষে খুবই অসহনীয় বলিয়া বোধ হইল। এজন্য লতিফের উপর তাহার খুব রাগ হইল।

তাহার সুন্দর মুখখানি মীর লতিফের ইচ্ছা সাধিত এই অপমানে লাল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অনুশোচনার ঝড় উঠিল। সে ঝড়ের বেগ সে সহিতে পারিল না।

সে দিন রাত্রে, আনার একটুকুও ঘুমাইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রিটা শয্যায় শুইয়া সে খুব কাঁদিল। কান্নাতে তাহার প্রাণের ভার যেন অনেকটা কমিয়া গেল। বুকের ভিতর যে ঝড়টা শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল—তাহা যেন অন্যদিকে চলিয়া গেল।

অবশ্য এ কান্নাটা অভিমানের ফল। অভিমানের উদ্ভবক্ষেত্র হইতেছে—ক্রোধ। ক্রোধের মাত্রাটা কমিয়া গেলে, অভিমানটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু কমিয়া আসে।

আনারউন্নিসা মীর লতিফের সেই পত্রখানির কথাগুলি ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া, আর নানাদিক দিয়া ভাবিবার পর বুঝিল, মীর লতিফ যাহা বলিয়াছে, তাহাই ঠিক। সে যাহা সংকল্প করিয়াছে, সত্যই তাহা আত্মত্যাগের জলন্ত পরিচয়। পাছে সে আমার ভবিষ্যৎ সুখের পথে অন্তরায় হইয়া পড়ে, এই জন্যই সে দূরে যাইতে চায়। স্মৃতির মৃত্যু ঘটাইতে চায় বলিয়াই সে আমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া, তাহার হৃদয়ের সহিত মহাসংগ্রামে প্রস্তুত হইতে উদ্যত।

যে মীর লতিফ্‌কে একটু আগে সে অকৃতজ্ঞ ভাবিয়া মনে মনে খুবই তিরস্কার করিয়াছিল, এখন এইরূপ আলোচনার ফলে, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, সে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে করিল। সে কেবলমাত্র বলিল—“লতিফ! এত মহৎ তুমি!”

তারপর ব্যাকুল হৃদয়ে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে পুনরায় বলিল—"লতিফ্! লতিফ্! আমায় মার্জ্জনা কর তুমি। তোমার হৃদয়ে যে দেবতার মহত্ত্ব। তোমার প্রাণ যে আত্মত্যাগের সজীব মন্ত্রে উদ্দীপিত। তোমার হৃদয় যে আমার সুখের জন্যই কাতর। আমার হিতের জন্যই যে তুমি অতি ব্যাকুল। তাই তুমি প্রাণের মহত্ত্ব দেখাইয়া নিজের আশাভরসা,তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা,সুখের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে! যেখানে থাক না তুমি—সুখে থাকিও। আর আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুমি, আমি যেন জীবনের এই পরিবর্ত্তনে, এই পরীক্ষাময় সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য—স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যগুলি করিতে পারি। দেবতুল্য তুমি! আমার মনের কথা বুঝিতে ত তোমার বাকী নাই। একদিন নিজের দেহের বহুমূল্য শোণিত দিয়া, তুমিই যে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। যদি কখনও তোমার এরূপ কোন বিপদ উপস্থিত হয়, খোদার নিকট প্রার্থনা করি, আমি যেন তোমার হিতের জন্য, আমার হৃদয়ের শোণিত সেইরূপে ঢালিয়া দিতে পারি।"

সেই দিনের প্রভাত হইতেই আনারউন্নিসার জীবনে নূতন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই মীর লতিফকে ভুলিবার জন্য জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল।

পুরুষের অপেক্ষা নারীর হৃদয়ের শক্তি যেন একটু বেশী। আর সহিষ্ণুতা খুবই বেশী। আনারউন্নিসা এই চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে, হৃদয়ের সহিত মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাগ্য মানুষকে যে পথে লইয়া যায়, ভবিতব্য তাহার নিজের ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বহিতে, যে ভাবে মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ দিন গুলির জমা খরচ মিলাইয়া, খতিয়ান করিয়া লুকাইয়া রাখে, তাহা মহাশক্তিবান মানবেরও জানিবার সাধ্য নাই। আনার-উন্নিসা ত তাহাদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং ভবিতব্যের অব্যর্থ লেখনী তাহার ভবিষ্যৎকে যে পথে চালিত করিল, সে সেই পথেরই পথিক হইল।

আর বেশী ভূমিকা না করিয়া, আমরা সোজাসুজি বলিয়া ফেলিব, এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে, জামাল খাঁ তাহার রূপসী কন্যা আনারউন্নিসাকে নবাব সুজাবেগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

অতবড় একজন ধনী ওমরাহের বিবাহে, যেভাবে জাঁক-জমক হওয়া প্রয়োজন বা সঙ্গত, তাহার কিছুই হইল না। তাহার গূঢ় কারণ—নবাব সুজাবেগই জানেন। তবে এটুকু বলা যায়, এই উদ্বাহ ব্যাপারে মাঝামাঝি রকমের একটা আনন্দও উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল বটে। তাহাতে কেবল জামাল খাঁ ও সুজাবেগের অতি অন্তরঙ্গ মিত্র ও আত্মীয়বর্গ ই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বিবাহান্তে জামাল খাঁর ঋণের সেই তমসুক খানি, ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার জামাতা তাঁহাকে ঋণ মুক্ত করিলেন।

নবাবের ইচ্ছানুসারে, বিবাহের দুই সপ্তাহ পরেই আনার উন্নিসা পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া তাহার স্বামীর প্রাসাদতুল্য, বহুমূল্য সজ্জাপূর্ণ বিচিত্র ভবনে আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এক দিন এই বাড়ীতেই সে আমন্ত্রিতা রূপে নবাব সুজাখাঁর নিকট হইতে সেই বহুমূল্য রত্নহার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সে দিন সে যে গৃহের অতিথি ছিল, আজ সে ঘটনাচক্র আবর্ত্তনে তাহার একাধিশ্বরী।

আনার বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী। কিশোর অতিক্রম করিয়া সে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বর্ষার ভরা নদী যেন কূলে কূলে পুরিয়া উঠিয়াছে। ঢলঢল লাবণ্য, আর ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি, মধুর অপাঙ্গে উজ্জ্বল কটাক্ষ, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অনুরাগ। ভাগ্যের নূতন পরিবর্ত্তনে সে এখন এক প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার অভিষিক্ত রাজরাণী।

স্পর্শমণির স্পর্শে, লৌহও সুবর্ণ হইয়া থাকে। আনার উন্নিসার আগমনে নবাব সুজা খাঁর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা যেন সুখ সৌভাগ্যে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার চারিদিকে একটা নূতন শ্রী সম্পদ ফুটিয়া উঠিল।

যেখানে যেটি রাখিলে সুন্দর দেখায়, যেটি করিলে ভাল হয়, আনারউন্নিসা সেইভাবেই তাহার নিজের ও স্বামীর ব্যবহৃত কক্ষগুলি সাজাইল। আগে যে সমস্ত কক্ষের প্রত্যেক সজ্জায়, রুচির অভাব আর একটা বিশৃঙ্খল ভাব দেখা যাইত, তাহা যেন শৃঙ্খলার মোহকরী স্পর্শে অতি সুন্দর অবস্থায় দাঁড়াইল।

দাসী বাঁদী যারা, তারা আনারের মিষ্টকথা আর সুন্দর ব্যবহারে, সত্য সত্যই তাঁহার গোলাম হইয়া পড়িল। সকলের মুখেই একটা সন্তোষের ভাব। সকলেরই সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ ও নিষ্ঠা। কাজকর্ম্ম সমস্ত যেন মন্ত্রবলে চলিতে লাগিল। আর নবাব সুজা বেগ এতদিন পরে বুঝিতে পারিলেন—নারীর মোহকরী শক্তি কতদূর। সুগুণা সুরূপসী পত্নী লাভ কত ভাগ্যের কথা। জ্বালার জীবনে স্নেহময়ী পত্নী যে শান্তির প্রস্রবণ! সুবুদ্ধিমতী কর্ত্তব্য পরায়ণা রূপসীর আদর কত মূল্যবান। শূন্য প্রাণের পূর্ণতা কোথায়? জ্বালাময় মর্ত্তে-স্বর্গের সুখ কেমন করিয়া মিলে?

সেই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার দক্ষিণে একটী বহুদূর ব্যাপী পুষ্পোদ্যান। যত্নের অভাবে, তাহা যেন দিনে দিনে হীনশ্রী হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু আনারের সুন্দর ব্যবস্থায়, আর যত্নময় তত্ত্বাবধানে, তাহাতে একটা যেন নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিল। পুষ্পোদ্যানের নানাস্থলে সুন্দর মর্ম্মরবেদী, নব-প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জবীথি। কোথায় বা কৃত্রিম প্রস্রবণ। সেই হীনশ্রী শ্মশান-তুল্য উদ্যানভূমি মধ্যে যেন বসন্তের মাধুরী ফুটিয়া উঠিল।

দুইটী মাস মাত্র সে এই গৃহের অধীশ্বরী হইয়াছে। আর ইহার মধ্যেই গৃহস্থালীর সকল দিকেই এত পরিবর্ত্তন। সত্যই সে যেন রাজরাণীর গৌরবে, নিজের অধিকৃত মহলে একাধিপত্য করিতে লাগিল। মায়াবিনীর মত কি যেন এক কুহেলী মাখা মন্ত্রশক্তিতে, সকল দিকেই সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিল।

নবাব—সুজা খাঁও এতদিন পরে বুঝিলেন, সাতরাজার ধন এক উজ্জল মাণিক, বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছেন। সেই মাণিকের স্নিগ্ধোজ্জল জ্যোতিতে, আজ তাঁহার গৃহের প্রত্যেক কেন্দ্র উজ্জলিত। এতদিন তিনি আনারের সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, এখন তাহার গুণের যেন খুবই পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবনটা বড়ই সুখময় হইয়া পড়িল।

আনার তাঁহার গৃহলক্ষ্মী হইবার পর হইতে, নবাব সাহেব সেই শয়তানী বাহারবানুর স্মৃতি, তাঁহার মনের ভিতর হইতে ক্রমশঃ মুছিয়া ফেলিতে ছিলেন। খুবই সৌভাগ্যের কথা, যে বাহারবানু ঘটনাচক্রে পড়িয়া প্রায় দুই মাস হইল, আজমীরে চলিয়া গিয়াছে। কেন—তা সেই বলিতে পারে। যাইবার পূর্ব্বে, সে নবাব সুজাখাঁকে কোন সংবাদই দিয়া যায় নাই।

নবাবের সাধের "আরাম-মঞ্জিলে, সুতরাং চাবি পড়িয়াছে। তিনি আর বড় একটা সেখানে যান না। এখন সেখানকার কক্ষগুলি শূন্য ও পরিত্যক্ত। যাহার জন্য একদিন এই গুপ্ত আরামকক্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল, সে ত আর আগরায় নাই।

দেখিতে দেখিতে আরও একটা মাস কাটিয়া গেল। তবু বাহারের কোন সংবাদই নাই। কিন্তু তাহার জন্য নবাব সুজা খাঁ তিলমাত্র দুঃখিত নহেন। আর যেন ভবিষ্যতে তাহার কোন সংবাদ পাইতে না হয়, সে পাপ আর না আসিয়া জুটে, ইহাই যেন তাঁহার মনের কথা।

প্রমারায় নেশায় আর এই বাহারবানুর প্রবল অর্থ তৃষ্ণা মিটাইবার জন্ত, নবাব সুজা খাঁ এ পর্য্যন্ত খুবই অপব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। এখন জমা ও খরচের রেওয়া মিলাইয়া, তিনি বুঝিলেন—তাঁহার অপব্যয়ের মাত্রাটা খুবই অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে। যে অর্থ তিনি জীবনে উপায় করেন নাই, বাহারবানুর শোষণ নীতির ফলে, তাহার বেশী তিনি খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু এরূপ ভাবে-যদি আর কিছুদিন চলিত, তাহা হইলে তাঁহার সমূহ সর্ব্বনাশ ঘটিত। তাঁহার পরলোকগতা জননী, রুকিনা বিবি, বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে কোন খপরই রাখিতেন না। তবে এটা অবশ্য তিনি কাণাঘুষায় শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র এদানীং বড়ই উচ্ছৃঙ্খলভাবে অপব্যয় করিতেছেন। এজন্য তিনি পুত্রকে বহুবার তিরস্কার করিয়াছিলেন, সাবধান করিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু এ অপব্যয়ের পরিমাণ যে কত বেশী, তাহা তিনি জানিবার চেষ্টা কখনও করেন নাই।

সুতরাং এতদিনের পর নবাব সুজা বেগ তাঁহার জমা খরচের রেওয়া মিলাইয়া যখন বুঝিলেন, যে তাঁহার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ অপব্যয়ে উড়িয়া গিয়াছে, আর এই অপব্যয়ের পরিবর্ত্তে তিনি পাইয়াছেন—কেবল, বিশ্বাসঘাতকতা, সুতীব্র শ্লেষ আগাগোড়া একটা প্রতারণাময় ভালবাসা, তখন তাঁহার মনে বড়ই একটা কঠোর অনুতাপ জন্মিল। তিনি আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে মন দিলেন।

আর একটা ঘটনা,যাহা এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। সেটা আর কিছুই নয়। এই শান্তিরূপিনী আনারের সহিত বিবাহের পর হইতে আর বাহারবানুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেরাজির মায়া একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন এই আনার উন্নিসার অঙ্গুলি হেলনে তাঁহাকে চলিতে হইতেছে। অবশ্য এ শাসনের মধ্যে কঠোরতা নাই, শ্লেষ নাই, কাতর অনুযোগ নাই—আছে কেবল মিষ্ট কথা, প্রাণভরা আদর, গালভরা হাসি, হৃদয়ভরা স্নেহ,আর যত্ন মাখানো সোহাগ। এই প্রকার একটা বৈচিত্রময় ভালবাসার মধ্যে ফেলিয়া, এই রূপসী শ্রেষ্ঠা আনারউন্নিসা, নবাব সুজা বেগকে দিনে দিনে তাহার গোলাম করিয়া তুলিতেছিল।

বিলাসিনীর ছলনাময় প্রেমপ্রতারিত কলঙ্কিত চরিত্র নবাব সুজা বেগ, এখন আনারউন্নিসার ক্ষণিক বিরহে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই আনারকে দুদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করিতেও যেন তাঁহার কষ্টবোধ হয়। এই আনারউন্নিসার মুখখানি কোন কারণে মলিন দেখিলে, তাঁহার বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠে। তিনি মিষ্ট কথায়, অপরিমিত সোহাগে, পত্নীর চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করেন। তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলে, তাঁহার হৃদয়ের মধ্য হইতে যেন একটা ভারী বোঝা কোথায় সরিয়া যায়।

একদিনের একটা ঘটনা বলি। কোন একটা সরকারী কার্য্য উপলক্ষে, নবাব সুজাখাঁকে একটু দূরে যাইতে হইয়াছিল।

যে সময়ের মধ্যে তাঁহার ফিরিবার কথা ছিল, সে সময়টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিমল জ্যোৎস্না-লোকে শ্যামবর্ণা ধরণী হাস্যমুখরিতা। আনার উন্নিসার শয়ন কক্ষ পূর্ণভাবে উজ্জলিত। শয়নের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও সে শয্যা আশ্রয় করিতে পারিল না।

আনারউন্নিসা, মুক্তবাতায়ন পথ দিয়া জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া থাকিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"এত নিষ্ঠুর তুমি! আজ এত বিলম্ব করিতেছ কেন? এত দেরী ত কখনও কর না?"

এই সময়ে কে যেন পশ্চাৎ হইতে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া আসিয়া, তাহার চোখ দুটী চাপিয়া ধরিল। আনার, আগন্তুকের হাত দুটী ছাড়াইয়া লইয়া দেখিল, নবাব সুজা বেগ তাহার সম্মুখে।

সুজা বেগ সহাস্যমুখে বলিলেন—"আজ হাতে হাতে তুমি ধরা পড়িয়াছ। মেরে—জান্ পেয়ারে! আমাকে অকারণে দোষ দিতেছ কেন? তোমায় ছাড়িয়া কি আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে বহুক্ষণ কোথাও থাকিতে পারি।"

আনার। তবে আজ এত দেরী করিলে কেন?

সুজা। তুমি কি কর দেখিবার জন্য, পাশের কক্ষে একটু আত্মগোপন করিয়াছিলাম! ঠিক সন্ধ্যার পরই আজ আমি বাটীতে ফিরিয়াছি।

আনার। তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুর নও ত কি?

সুজা। কিসে?

আনার। আমায় এত অনর্থক ভাবাও কেন?

সুজা। আমার অপরাধ হইয়াছে। মার্জ্জনা কর—আনার-বেগম!

আনার। একটী করারে আমি তোমায় মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত।

সুজা। কি করার তোমার—শুনিতে পাই কি?

আনার। সাতদিন তোমাকে এই বাড়ীর মধ্যে নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে।

সুজা। গোলামের গোলাম আমি। হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাকে চৌকি দিবার জন্য কাহাকে বাহাল করিবে।

আনার। এই দুটী চক্ষুকে!

সুজা। ভাল-তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে।

আনার। কি?

সুজা। তোমার বীণ্‌টা একবার তুলিয়া লও। তোমার সেই গানটী একবার আমাকে শুনাও।

আনার। না—তা আমি পারিব না। আমার বড় লজ্জা করে।

সুজা। আমি নবাব সুজা বেগ, মুকিম—বাদশাহী, মোগল

সরকারের দৌলতখানার হেপাজতকার। আমার হুকুম তোমাকে তামিল করিতেই হইবে!

আনার। আর আমি খোদ নবাব—বেগম—আনারউন্নিসা। নবাব সুজা খাঁর মালেক্—আমার খুস্ মেজাজের হুকুম, আমি গাহিতে পারিব না।

এই কথা বলিয়া আনারউন্নিসা একটী তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। আর নবাব সুজা বেগ, এই কটাক্ষ-বিশিখ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া, আনারকে স্নেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

বারান্দার বাহিরে একটা হীরামন তাহার দাঁড়ের উপর বসিয়া দুলিতেছিল। সে সহসা কি একটা খেয়ালবশে, শিশ্ দিয়া উঠিল—"শিঃ—শিঃ—শিঃ।"

আনারউন্নিসা, সজোরে নবাবের আলিঙ্গন পাশ মুক্ত হইয়া সহাস্যমুখে বলিল—"ছিঃ –ছিঃ নবাবসাহেব কর কি? পাখীটাও যে আমাদের অবস্থা দেখিয়া বিদ্রূপ করিতেছে।"

নবাব সুজা বেগ আনারের আরক্ত গণ্ড দুটী মৃদুভাবে টিপিয়া দিয়া বলিলেন—"অই—ছি—ছি আমার না তোমার, আনার উন্নিসা? পাখীটা বলিতেছে কি জান আনার? ছিঃ—ছিঃ প্রিয়তমের এক দণ্ডের অদর্শনে যে একটু আগে এতটা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, সে এখন তাহার প্রাণের জিনিসকে কাছে পাইয়া উপেক্ষা করিতেছে। তাই বলিতেছে—ছি! ছি!

আনারউন্নিসা কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল—"আজ তুমি বড় শ্রান্ত হইয়াছ! একটু সেরাজি দিব কি?"

সুজা বেগ কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিলেন—"ছিঃ! ওকথা কি আর বলিতে আছে? যে নেশায় আজ আমাকে তোমার গোলাম করিয়া রাখিয়াছে সেরাজির নেশা কি তার চেয়েও বেশী জমাট? সেরাজির নেশা শীঘ্রই ছুটিয়া যায়! কিন্তু তোমার অই অফুরন্ত প্রেম মদিরায় উন্মত্ত হইয়া দুনিয়ায় সব ভুলিয়া, আমি যে মাতিয়া আছি, তাহা যে ছুটিবার নয় আনারউন্নিসা!

আনার সহাস্যমুখে বলিল—"সত্যি নাকি? আমি যদি কাল কবরে যাই। তাহা হইলে নেশা ছুটিয়া যাইবে না তো?"

সুজা বেগ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"ছি! ও কথা বলিতে নাই।

এই কথা বলিয়া আবেগভরে আনারকে বুকে জড়াইয়া লইয়া, নবাব সুজাবেগ তাঁহার এই নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইলেন।

এই সময়ে পাখীটা আবার চীৎকার করিয়া শীশ্ দিয়া উঠিল—"শি—শি" অর্থাৎ "ছিঃ—ছিঃ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ সুখ স্বপ্নঘেরা অবস্থায়, তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে, বাহারবানুর কোন সংবাদই নাই। আর সে জন্য নবাব সুজাখাঁ একটুও দুঃখিত নহেন। কেন না, তখন তাঁহার গৃহকক্ষে এক সুরভিমাখা নন্দনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আর, সমুজ্জ্বল বেশধারিণী, সদাহাস্তমুখী, রূপসীশ্রেষ্ঠা আনার উন্নিসা, মূর্ত্তিময়ী আনন্দরূপে সুজাখাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত এই নবীন নন্দনে বিরাজ করিতেছে।

বোধ হয় বিধাতার সৃষ্টিতে অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মল প্রেমের উপর যেন একটা অভিশাপ চিরদিনই লাগিয়া আছে। সুজাখাঁ ও আনার উন্নিসা তাঁহাদের পবিত্র দাম্পত্য জীবনটী, বড়ই সুখের সহিত অতিবাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু এই দৈব অভিশাপের অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থায়, সেই অনাবিল সুখস্রোতে এবার ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল। একটী দিনের সামান্য একটী ঘটনাতেই ভবিষ্যতের একটা মহা বিপদের বীজ রোপিত হইল। শান্তিময় সংসারে অশান্তি ফুটিয়া পড়িল।

ব্যাপারটী এই। নবাব সুজাখাঁ সে দিন শাহাজাদা দারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ইহার কারণ এই, সুলতান দারা শেকো লাহোর হইতে ফিরিয়াই তাঁহাকে কোন জরুরি কাজের জন্য তলব করিয়াছিলেন।

উজ্জ্বল মধ্যাহ্ণ। আনারউন্নিসা,একখণ্ড চতুষ্কোণ লাল মখ্‌মলের উপর, সূচের সূক্ষ্ম কাজ করিতেছিল। এসব সাঁচ্চার শিল্প অতীত যুগের গৌরবের জিনিস। আর এইরূপ সূক্ষ্ম শিল্পে আনারের খুবই একটা নিপুণতা ছিল। সুতরাং মধ্যাহ্নের অবসর কালে সে অনেক সময় সূচীর সাহায্যে তার সংসারের প্রয়োজনীয়, রেশমী বস্ত্রের উপর অনেক রকমের চিকণের কাজ করিত। আবার কখনও কখনও বা ওমারখায়েম, সাদী, গুলেস্তাঁ পড়িয়া

তাহার দীর্ঘ অবসর কালের বিরক্তির ভাবটা লঘু করিয়া ফেলিত।

একটী কথা আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আনার উন্নিসা, তাহার বাল্য সঙ্গিনী জুমেলিকে সঙ্গে লইয়াই, স্বামী গৃহে আসিয়াছিল। জুমেলিও এই নির্জ্জন বাড়ীতে, তাহার প্রিয় সঙ্গিনী রূপেই ছিল।

সে দিন কে জানে কি কারণে, আনার তাহার অভ্যস্ত শিল্প কার্য্যেও তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছিল না। তাহার মন যেন পদ্মপত্রের উপর জলের মত চঞ্চল। কিন্তু সহসা কেন যে এরূপ হইল, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না।

ওমারখায়েমের কবিতাগুলি সব চেয়ে তার ভাল লাগিত। সে তাহার একটী কবিতা ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিল।

ঠিক এই সময়ে জুমেলি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"এক অবগুণ্ঠিতা ওমরাহ-পত্নী, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন!"

আনার সবিস্ময়ে বলিল—"ওমরাহ পত্নী! কই এমন কোন ওমরাহ পত্নীর সঙ্গে ত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই! কে তিনি? কেমন করিয়া জানিলি যে তিনি ওমরাহ পত্নী?"

জুমেলি। তিনি নিজেই বলিলেন।

আনার। তাঁহার মুখের চেহারা কিরূপ?

জুমেলি। মুখ দেখিতে পাই নাই। বলিলাম ত তিনি অবগুণ্ঠিতা।

আনারউন্নিসা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না—কে—এ ? সুতরাং বলিল—"তাঁহাকে সমাদরে এখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া আয় !"

পরক্ষণেই জুমেলি সত্য সত্যই এক অবগুণ্ঠিতা রমণীকে আনারের কক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, তাহার নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আনারউন্নিসা, সৌজন্যতার খাতিরে, তাহাকে সমাদর করিয়া, এক সোফার উপর বসাইয়া বলিল—"বড়ই সুখী হইলাম, যে আপনি দয়া করিয়া আমার এ গরীব-খানায় পদার্পণ করিয়াছেন। আপনার পরিচয় পাইলে খুবই সুখী হইব।"

সেই অবগুণ্ঠিতা রমণী অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সহাস্য মুখে বলিল—"আমায় চিনিতে পারিতেছ কি আনার বেগম ?"

বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে আনারউন্নিসা দেখিল, বাহারবানু তাহাকে বলিতেছে—"আমায় চিনিতে পারিতেছ কি, আনার বেগম ?"

আনারউন্নিসা, ত্বরিত গতিতে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ তুমি ?"

বাহারবানু বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে বলিল—"অত ব্যস্ত হইও না নবাব সুজাবেগের আদরিণী পত্নী ! যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহাতে কেবল যে আমার স্বার্থই জড়িত—তাহা নয়। আমার কথাগুলি না শুনিলে, হয়ত তোমার নিজের স্বার্থে আঘাত

লাগিতে পারে। আর এ টুকুও আমি তোমায় বলিতে পারি, যে সে আঘাতের শক্তিটা সরাসর মুখ বুজিয়া সহিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে।"

এ যে অদ্ভুত রকমের ভয় প্রদর্শন! বাহারবানু যে ভাবে কথা কহিতেছিল—সেটা যে সম্পূর্ণ উপেক্ষার ভাব! সেই গৃহের সর্ব্বক্ষমতাময়ী গৃহস্বামিনী সে। একাধিশ্বরী সে! সামান্য এক কলঙ্কিতা রমণী যে এতটা স্বাধীনতা লইয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে—এত স্পর্দ্ধা তার?

আনারউন্নিসার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন শক্তি তাহার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিল। সে বিরক্তির সহিত বলিল—"আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাই না। তোমার মত স্ত্রীলোকের সঙ্গে, কোন কথাই আমার থাকিতে পারে না। তোমার প্রকৃত পরিচয় তুমি সে দিন না দিলেও, তার পরক্ষণেই আমি তোমার পরিচয় পাইয়াছি। এখন আমাদের যতটুকু কথাবার্ত্তা হইল, তাহাই যথেষ্ট। তুমি অতি অশিষ্ট ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ। কিন্তু তাহাও আমি উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত। তুমি এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও। আমার এ কক্ষ তোমার অপবিত্র নিশ্বাসে কলুসিত করিও না।"

বাহারবানু, বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে বলিল—"চলিয়া যাইব? কেন? নবাব সুজাবেগের উপর কি আমার কোন অধিকারই নাই? দুই তিন মাসের জন্য আমি আমার ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া একটু দূরে ছিলাম, তাহাতেই তুমি এতটা আধিপত্য

সঞ্চয় করিয়াছ ? না—আনারউন্নিসা ! ব্যহারবানু তাহার জীবন থাকিতে তোমাকে নবাব সুজাখাঁর উপর একাধিপত্য করিতে দিবে না—তোমার এ স্পর্দ্ধা, এ দর্প সহ্য করিবে না।

আনারউন্নিসা, বাহারবানুর এইরূপ অশিষ্টতাপূর্ণ ভয় প্রদর্শনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে রুষ্ট স্বরে বলিল "তুমি এখনই এস্থান হইতে চলিয়া যাও। না গেলে আমার ভৃত্যেরা তোমাকে অপমান করিয়া এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে।

বাহার। সাধ্য কি তোমার ভৃত্যদের—যে তাহারা আমার সম্মুখে অগ্রসর হয়! এক দিন যখন আমি নবাব সুজাখাঁর হৃদয়ের পূর্ণ অধিশ্বরী ছিলাম—তখন তোমার এই সব ভৃত্য আমার অনেক নিমক খাইয়াছে। ভৃত্যের প্রয়োজন কি ? তোমার স্বামী নবাব সুজাখাঁকে না হয় একবার সংবাদ দাও। দেখি, তিনি নিজেই আমাকে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হন কি না ?

ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্র চালিত হইয়া, নবাব সুজাখাঁ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ মাত্রেই যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল ; নির্জ্জন পথ-বাহী পথিক, সহসা কোন উন্নতফণা বিষধর সম্মুখে দেখিলে যেমন আতঙ্কে চমকিয়া দুরে সরিয়া দাঁড়ায়, নবাব সুজাখাঁ তাঁহার পত্নীর নিভৃত কক্ষ মধ্যে, এই কলঙ্কিতা বাহারবানুকে দেখিয়া, ততোধিক সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু তাঁহার ক্রোধ সংবরণের একটা শক্তি ছিল। আভিজাত্য গৌরব ও মর্য্যাদার একটা দর্পও ছিল। তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুর কক্ষ

মধ্যে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর বিশ্রামাগারে, বাহারবানুর মত কলঙ্কিতার উপস্থিতি ব্যাপারটা, তাঁহার হৃদয়ে বড়ই একটা আঘাত করিল। তিনি বিরক্তিসূচক স্বরে, বাহারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি প্রয়োজনে এখানে আসিলে বাহারবানু?"

বাহারবানু, নবাবকে একটী সেলাম করিয়া শ্লেষপূর্ণ মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"জনাবের চরণ দর্শন করিব বলিয়া। এই তিন মাস দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, এজন্য আমার দিলটা বড়ই বেতমিজ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া জনাবালির সঙ্গে গোপনে দুই চারিটী কথা কহিব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি।

নবাব সুজাবেগ, একবার মাত্র আনারউন্নিসার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—বাহারের এই ধৃষ্টতাসঞ্জাত অপমানে আনারউন্নিসা খুবই ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আরক্তিম গণ্ড-দেশের ক্রোধজনিত লাল আভা তখনও সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় নাই। নাসারন্ধ্র স্ফীত, চক্ষে বিদ্যুৎ রেখা—মুখেও যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবাব সুজাবেগ, বাহারবানুর দিকে চাহিয়া, দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—"তোমার যদি কোন বিশেষ গোপনীয় কথাই থাকে, তুমি আমার সঙ্গে এস। এ কক্ষে আসা তোমার খুব অন্যায় কাজ হইয়াছে।"

বাহারবানু এ কথায় মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল—"কেবল আপনাকে নয় আপনার নূতন বেগম এই আনারউন্নিসাকেও আমার দুই চারিটা কথা বলিবার ছিল।

কিন্তু আপনি আসিয়া পড়ায় বলা হইল না। যাই হোক,—এই বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে আজ যতটা অপমানিত হইতে হইয়াছে, তাহাই বোধ হয়, জনাবের এক সময়ের এই আদরিণী বাহারবান্থর পক্ষে যথেষ্ট! তবে এই অপমানের প্রতিশোধের জমা খরচ, একদিন সুবিধা মত আপনার সঙ্গেই হইবে।"

সুজাবেগ বাহারবান্থকে আর বেশী কিছু বলিবার অবসর না দিয়া ও তাহাকে পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত পূর্ণ সংকেত করিয়া, সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহারও ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। প্রকারান্তরে সে দিন বাহারবান্থরই জিত হইল। সে যে কথাটা আনারউন্নিসাকে শুনাইবার উপযুক্ত অবসর অপেক্ষা করিতেছিল, সুজার্খা সহসা সেই কক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সেই বক্র অবসর পথকে সরল করিয়া দিলেন।

আনার বুঝিল—যে স্বামীকে সে তাহার জীবনের যাহা কিছু প্রিয়, সব দিয়া ভাল বাসিয়াছে—তাহার সেই স্বামীর উপর এই শয়তানীর খুবই বেশী আধিপত্য। যে স্বামীর অতীত জীবনের, কলঙ্ককাহিনীর কথাগুলি সে চেষ্টা করিয়া ভুলিতেছিল এই সর্ব্বনাশিনী কলঙ্কিনী বাহারবান্থ এক তীব্র ফূৎকারে তাহা জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নবাব সুজা খাঁর ভালোর দিকে পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনার-উন্নিসা, তাহাকে তাঁহার অতীত জীবনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কখনও কোন প্রশ্ন করে নাই। সে অনেক দিক দিয়া ভাবিয়া বুঝিয়াছিল—অতীত তো মরণের গর্ত্তে। আর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের উদরে। বর্ত্তমানই তখন তাহার সম্মুখে সজীব ও জাগ্রত রূপে বিদ্যমান। অতীতের স্মৃতি যখন বিষময়, তখন তাহাকে বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিয়া দেওয়াই ঠিক! এইজন্যই বাহারবানুর সঙ্গে পীর মহরমে তাহার সাক্ষাৎ ব্যাপারের সকল কথাই, সে স্বামীর নিকট ইচ্ছা করিয়াই গোপন করিয়াছিল।

নবাব সুজা খাঁ,বাহারবানুকে লইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলে, আনারের মনে একটা দারুণ সন্দেহের ছায়া জাগিয়া উঠিল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার স্বামীর উপর এই শয়তানী বাহারের এতটা প্রভাব কিসের জন্য ? আরও তাজ্জব কথা—যে বাহারবানুর সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করিবার সময়, নবাব তাঁহাকে একটীও সান্ত্বনার কথা বলিয়া গেলেন না! আনারউন্নিসা এই সব ঘটনার বিচারে বুঝিল, সেদিনকার বাজি তাহার হার হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ হারের বাজি কি আবার জিত হয় না? হওয়া সম্ভব, যদি নবাব সুজা বেগ এই ছলনাময়ী বাহারবানুকে জন্মের মত ভুলিতে পারেন। ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

প্রাণভরা সরলতা, নেত্রে উচ্ছসিত প্রেমরাশি, মুখভরা হাসি, হৃদয়ভরা স্বার্থকলঙ্ককলুষশূন্য অনাবিল, পবিত্রপ্রেম, পত্নীর ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য, স্বামী: হৃদয়ের এক সময়ের দুর্ব্বলতাজনিত পদস্খলনের অপরাধ গোপন, এই সবই ত তাহার পত্নীত্বের কর্ত্তব্য। হায়! কি করিয়া সে তাহার স্বামীকে এই ছলনাময়ী স্বৈরিণীর কবল মুক্ত করিবে? কে তাহাকে সে পথ দেখাইয়া দিবে।

পরক্ষণেই সে ভাবিল—চেষ্টায় না হয় কি? সাধনার ফলেই যে সিদ্ধিলাভ। এই পবিত্র আবাস মন্দিরের অধিষ্ঠিতা দেবী সে। সেই গৃহের রাজরাজেশ্বরী সে। স্বামী তাহার। তাহার পত্নীত্বের একটা কর্ত্তব্য আছে,দাবি আছে, অধিকার আছে—সে অধিকার তাহাকে জীবন পণ করিয়াও বজায় রাখিতে হইবে। নিজের সকল সুখ স্বার্থ, বিলাসভোগ সবই দমন করিয়া সতর্ক প্রহরীর মত, এই স্বামীকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে হইবে। প্রতি কথায় প্রতি কার্য্যে বুঝাইতে হইবে, যে এই নবাব সুজা খাঁ তাহার সর্ব্বস্ব। পতির উপর স্বাধ্বী পত্নীরই ষোল আনা অধিকার।

এইরূপ চিন্তায় আনার মনে মনে একটা সাহস পাইল। অন্ধকারময় পথে সে যেন একটু আলোক ছটা দেখিতে পাইল। তাহার হৃদয়ে নারীর স্বভাবসিদ্ধ আত্মগরিমা, পত্নীর রাজরাজেশ্বরীত্ব ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে অতি ধীরপদে, অতি সন্তর্পণে তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সুজাখাঁ যে কক্ষে

বাহারের সহিত প্রবেশ করিলেন, ঠিক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে আত্ম গোপন করিল।

সে দেখিল, নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে নবাব সুজা খাঁ চিন্তামগ্নভাবে পাইচারি করিতেছেন। তাঁহার গভীর চিন্তার বিষয়টা কি, তাহা যেন আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াই, সেই শয়তানী বাহারবানু, এক ক্ষুদ্র সোফার উপর বসিয়া মৃদু হাস্য করিতেছে। অবশ্য চিন্তামগ্ন নবাব সুজা খাঁ, তাহার এ অবজ্ঞাময় অর্থপূর্ণ হাসিটি দেখিতে পাইতেছিলেন না।

কক্ষমধ্যে কয়েকখানি উজ্জ্বল মুকুর। সমগ্র কক্ষ উজ্জ্বল দীপালোকিত। সুগন্ধি দীপের কম্পিত আলোকমালার চঞ্চল প্রতিবিম্ব, সেই সব মুকুরে পড়িয়াছে। নবাব সুজা খাঁ বাহার-বানুর দিকে পিছন করিয়া সেই মুকুরের দিকে চাহিয়া আছেন

বাহারবানু মনে মনে কি ভাবিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যভরা, লাবণ্যমাখা মুখখানির প্রতিবিম্ব নবাব সুজা খাঁর সন্মুখস্থ দর্পণের উপর পড়িল। নবাব সুজা খাঁ, সে লাবণ্যময় মূর্ত্তির ছায়া, দর্পণে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। আর সেই দর্পণগাত্রাবলম্বী ছায়া-মূর্ত্তিও যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নবাব মুখ ফিরাইবামাত্র,দেখিলেন বাহারবানু তাঁহার সন্মুখে দাঁড়াইয়া। তিনি তিরস্কার পূর্ণস্বরে বলিলেন—"বাহারবানু! তোমার অনেক অপরাধ আমি ইতি পূর্ব্বে মার্জ্জনা করিয়াছি।

অনেক বড় বড় ত্রুটি, উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু তোমার আজ্‌কের অপরাধের কোন মার্জ্জনা নাই।"

বাহারবানু গম্ভীরমুখে বলিল—"অপরাধ যে কিসে হইল, জনাব! তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

সুজা বেগ। যে অপরাধী, সে কি সহজে তার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারে? কেন তুমি এখানে এভাবে আসিলে?

বাহারবানু। সত্য কথা বলিব কি নবাব! বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে কি?

সুজা বেগ। কোন কথাই শুনিতে চাহি না। দুষ্ট বুদ্ধি বশে যাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহা আর ফিরিবে না। তুমি এখনিই এস্থান ত্যাগ কর।

বাহারবানু। যদি না করি?

সুজা বেগ। তাহা হইলে বুঝিব, তুমি অতি নির্লজ্জা। অতি ঘৃণিতা। আত্মসম্ভ্রমের মূল্য জ্ঞান তোমাতে খুব কম!

বাহারবানু। এখন এ সব কথা বলিবে বই কি? কিন্তু মনে কর সেই দিনের কথা—নবাব সুজা বেগ! সে দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সাধাসাধি করিয়া তুমি আমাকে তোমার পার্শ্বে বসাইতে পার নাই। মনে কর, সেই দিনের কথা নবাব—যেদিন আমি তোমার এই নবাবী সম্মান রক্ষার জন্য, প্রেমারার আড্ডায় একদল ওমরাহের সম্মুখে তোমার ইজ্জত বজায়ের উদ্দেশ্যে, আমার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য রত্নহার খুলিয়া,তোমার বাজির দানের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলাম। মনে কর নবাব! সেই দিনের কথা,

যে সময়ে আমায় ছাড়িয়া তুমি এক মুহূর্ত্ত কালও থাকিতে পারিতে না। আমি একদিন আরামবাগে না আসিলে, তুমি আমার উদ্যানে গিয়া আমার উপাসনা করিতে। সাধিয়া কাঁদিয়া আমায় তোমার আরামবাগে আনিতে। হায়! এত শীঘ্র কি তুমি সব ভুলিলে?"

নবাব সুজা বেগ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, অপেক্ষাকৃত ধীর ভাবে বলিলেন—"না ভুলি নাই। কিন্তু আজ তুমি এখানে আসিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ। এখানে না আসিয়া আরামবাগ হইতেই ত তুমি আমায় সংবাদ দিয়া পাঠাইতে পারিতে।"

বাহারবানু। সেটা অবশ্য আমি প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি নাই।

সুজা বেগ। কেন?

বাহার। অনেক দিন হইতে এই আনার উন্নিসার সৌন্দর্য্য-গৌরবের কথা শুনিয়াছিলাম। তাই তাহাকে একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম।

সুজা বেগ বুঝিলেন, এটা স্তোক বাক্য বই কিছুই নয়। তিনি নীরস হাস্যের সহিত বলিলেন—"বোধ হয় সে তোমার চেয়ে সুন্দরী নয়।"

এটা কঠোর বিদ্রুপ। চতুরা বাহারবানু, নীরবে এ বিদ্রুপটা সহ্য করিয়া বলিল—"এক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের বিচারক তুমি। একদিন আমাকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া সপ্তমস্বর্গে তুলিয়াছিলে—আমার চরণে অবনত হইয়াছিলে। তাই, কৌতুহলবশে দেখিতে

আসিয়াছিলাম হয়ত এই আনারউন্নিসা আমার চেয়ে খুবই সুন্দরী। তাহা না হইলে সে আমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্য হইতে এরূপ ভাবে সরাইয়া দিবে কেন?

সুজা বেগ সেই কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন—"এখন তোমার মনের অভিপ্রায় কি বল দেখি?"

বাহারবানু। তুমি এখনি আমার সঙ্গে আরামবাগে চল।

সুজা। হইতেই পারে না। সুলতান দারা লাহোর হইতে আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই আমাকে তলব করিয়াছিলেন। আমিও দুর্গের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আবার আমাকে সন্ধ্যার পর যাইতে বলিয়াছেন। সুতরাং তোমার সঙ্গে আরামবাগে যাওয়ার সময় আমার নাই।

বাহারবানু কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। চিন্তাপীড়িত ভাবে তাহার ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিল। তারপর একটা কঠোর হাস্যের সহিত বলিল—"আবার দারার সঙ্গে মাখামাখি করিতেছ?"

এই কথা শুনিয়া নবাব সুজা বেগ—চকিতভাবে কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া—বাহারের হাতখানি সশঙ্কিতভাবে টিপিয়া দিয়া বলিলেন—"চুপ! দেওয়ালেরও কাণ আছে।"

বাহারবানু বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুজার এই ঈঙ্গিত যেন তাঁহার বাক্যকথনেচ্ছু ঠোঁট দুটীকে খুব জোরে চাপিয়া ধরিল।

সে কেবলমাত্র বলিল—"ভাল, এখন আমি বিদায়

লইতেছি। কিন্তু তোমার সহিত একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হওয়া খুবই প্রয়োজন।"

সুজা বেগ—বাহারবানুকে আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—"কাল রাত্রে তুমি আরামবাগে যাইও, আমি সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

"সেই ভাল"—এই দুটীমাত্র কথা বলিয়া নবাব সুজা খাঁর দিকে একটী বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বাহারবানু আর কিছু না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

নবাব সুজা বেগ ও বাহারবানুর মধ্যে যাহা কিছু ঘটিল, পার্শ্বস্থ কক্ষে অতি সংগোপনে থাকিয়া একজন তাহার সবই লক্ষ্য করিল। তাঁহাদের উভয়ের কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না।

এ গুপ্ত কথা শ্রবণকারী আর কেউ নয়, নবাব সুজা বেগের নব পরিণীতা পত্নী আনারউন্নিসা বেগম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা, বুকে লইয়া, আনারউন্নিসা তাহার কক্ষ মধ্যে ফিরিয়া আসিল। নানাদিক দিয়া এই মাত্র পরদৃষ্ট দৃশ্যগুলি ভাবিয়া, তাহার আহত হৃদয়ের ব্যথা নিবারণের জন্য, সে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

স্বভাবতঃই আনারউন্নিসা বড়ই অভিমানিনী। অনেক সময় রাগিলে তাহার ধৈর্য্য থাকিত না। মাতৃহীনা কন্যা বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কাজেই সে অতিরিক্ত মাত্রায় অভিমানিনী হইয়া পড়িয়াছিল।

স্ত্রীলোকে সব জিনিষের ভাগ ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু স্বামীর ভালবাসার অংশ সে কাহাকেও দিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং আনার উন্নিসার প্রাণে, সন্দেহের যে ধূমায়িত অগ্নি এত দিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল—সে দিনের ঘটনায় সহসা যেন তাহা প্রবল গর্জ্জনে জ্বলিয়া উঠিল।

কে এই বাহারবানু! এক কলঙ্কিতা, ঘৃণিতা স্বৈরিণি সে—তাহার এত স্পর্দ্ধা কেন? সে যে সহসা আসিয়া তাহার শুদ্ধান্তঃপুর কলঙ্কিত করিল, তৎসম্বন্ধে তাহাকে তিরস্কার না করিয়া এই মোহাচ্ছন্ন নবাব সুজাবেগ কিনা তাহারই তোষামোদ করিয়া, যেন তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তার উপর এই সারাদিনটা কাটিয়া গেল, তিনি তাহাকে শান্ত করিবার বা দুটা মিষ্ট কথা বলিবার জন্যও একটুও সময় পাইলেন না?

প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভালবাসার কি এই প্রতিদান! একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণের কি এই পরিণাম! যাহার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য সে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, এই কি তাহার এক প্রবণ হৃদয়া পত্নীর সহিত সঙ্গত ব্যবহার?

যে স্বামী তাহার ইষ্ট, জীবনের ধ্রুবতারা, এ দুনিয়ার উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট সুখ স্বপ্ন, তাহার এই কি ব্যবহার? এই

কয় মাস যে নবাব সুজাবেগ যে তাহাকে কত মিষ্ট কথায়, কত মধুর প্রেম সম্বোধনে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন! সে সবই কি কপটতাময়? সত্যই কি তিনি এই স্বৈরিণীর ক্রীতদাস?

তার পর সে মনে মনে ভাবিল—"এই শয়তানী বাহারবানু যে তাহার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। হায়! কেন সে তাহার স্বামীর নিকট বাহারবানুর সহিত পীরমহরমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সমস্ত কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।"

এই বাহারবানু যে নিশ্চয়ই কোন একটা সাংঘাতিক গোপনীয় ব্যাপারের জন্য—তাহার স্বামীর উপর এতটা আধিপত্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা সে তাহাদের গুপ্ত কথোপকথনের শেষাংশ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ভিতরের ব্যাপারটা যে কি, তাহা জানিবার জন্য তাহার বড়ই একটা কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। আর এ কথাও সে ভাবিল, যে তাহার এই কৌতুহল নিবৃত্তির একমাত্র উপায়, তাহার স্বামী নবাব সুজাবেগ। কিন্তু তিনি কি তাহাকে সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বলিবেন?

এই ভাবে নানাদিক দিয়া অনেক রকমের সমস্যা, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় খানিকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকল দিক দিয়া সে এই সমস্যাময় ব্যাপারের সমাধানের জন্য একটা চেষ্টা করিতে লাগিল--কিন্তু পারিল না।

এই ভীষণ বিপদের সময় মীর লতিফের কথা সহসা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল—"হায়! মীর

লতিফ্ যদি আজ আগরায় থাকিত, তাহা হইলে হয়ত সে এই বিপদ সময়ে তাহাকে একটা সৎপরামর্শ দিতে পারিত।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আনার উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইল। অন্য দিন এই সময়ে জুমেলিকে সে সঙ্গে লয়। সে দিন সে অতি গোপনে—একাকিনীই উদ্যান মধ্যে চলিয়া গেল।

তাহার স্বহস্ত রচিত গুলাববাগের সদ্য প্রস্ফুটিত গুলাববাসে সেই স্থান আমোদিত। আনার এই গুলাববাগের মধ্যে এক মর্ম্মরাসনে বসিয়া, নিজের অদৃষ্ট কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

এ চিন্তার কুল কিনারা নাই। তাহার ভবিষ্যৎ যেন বড়ই কুয়াসাচ্ছন্ন। তাহার হৃদয়ে মীর লতিফের যে একটা উজ্জ্বল ছায়া বাল্যকাল হইতে পড়িয়াছিল, যাহা তাহার হৃদয় হইতে মুছিবার কোন উপায়ই ছিল না,সে তাহাও মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া অনেকটা সক্ষম হইয়াছে। সুজাবেগ সম্বন্ধে সে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত কুৎসার কথা শুনিয়াছিল, আর তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসও কতকটা করিয়াছিল, সে বিশ্বাসও সে ধীরে ধীরে মুছিয়া ফেলিয়াছে। নারী জীবনের কর্ত্তব্য, পত্নীর কর্ত্তব্য পালনই, তখন তাহার শ্রেষ্ঠ ব্রত। এই ব্রত পালনের জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল।

কত সুখের আশা, স্বপ্নের কল্পনা লইয়া, সে এই বৃহৎ পুরীর একাধিশ্বরী রাজরাণী রূপে দর্পভরে দিন কাটাইতে ছিল, কিন্তু আজ যে সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে। নবাব সুজা খাঁর ব্যবহারে সে বুঝিয়াছে, যে তাহার স্বামীর উপর এই বিলাসিনী বাহারবানুর শক্তি তার চেয়েও বেশী।

আনার মনে মনে বলিল—"হায়! কেন একটা নিষ্ঠুরতাবশে গোপনে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলাম? কেন ইচ্ছা করিয়া প্রাণের অশান্তি ডাকিয়া আনিলাম? বাহারবানু আমার সুখের সংসারে আগুণ জ্বালাইতে আসিয়াছিল। হায়! কেন আমি বুঝিতে না পারিয়া, স্বেচ্ছায় ফুৎকার দিয়া তাহার কলুষিত চিত্তপ্রসূত সেই আগুণ জ্বালাইলাম! কেন নিজের চিত্ত মধ্যে স্বেচ্ছাসৃজিত অশান্তির সৃষ্টি করিলাম? জগতে—লোকের নেত্রান্তরালে যে কত কি ব্যাপার যে ঘটিয়া যায়। কেই বা চেষ্টা করিয়া সকল ঘটনার সংবাদ রাখে? এ ব্যাপারে এরূপ উপেক্ষার ভাব দেখাইলে ত আমি এতটা মনকষ্ট পাইতাম না।

নারীর শক্তির কি কোন মূল্যই নাই? নারীর হৃদয়ে কি কোনই তেজোময় কার্য্যকরী শক্তি নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তির সহায়তায় আমি কি এই বাহারবানুর কবল হইতে, আমার স্বামীকে মুক্ত করিতে পারিব না?

এই বাহারবানু অর্থের প্রয়াসিনী। আমার স্বামী আমাকে স্ত্রীধন রূপে প্রচুর অর্থ দিয়াছেন। এই অর্থবলেও কি আমি বাহারকে আমার পথ হইতে সরাইতে পারিব না?

চেষ্টার ক্ষতি কি? চেষ্টায় না হয় কি? বাহারবানু এই সহরের বাহিরে থাকে শুনিয়াছি। আমার কোন বিশ্বাসী গোলামকে দিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাই। তাহাকে এখানে আসিতে আহ্বান করি। যদি আসে, তখন

যাহা করা কর্ত্তব্য, স্বামীকে রক্ষার জন্য, পত্নীর কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য, তাহাই করিব।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে—আলোকছটা দেখিতে পাইলে, অন্ধকারবেষ্টিত প্রান্তর পথবাহী পথিক যেমন আশান্বিত হয়, আনন্দিত হয়, আনারউন্নিসা, এই ভাবে চিন্তা করিয়া, তাহার ঘোরান্ধকারময় ভবিষ্যতের পথে যেন একটা আলো দেখিতে পাইয়া, সেইরূপ উৎফুল্লচিত্তা হইল।

এমন সময়ে জুমেলি সেইখানে আসিয়া—বলিল—"ব্যাপার কি বেগম-সাহেবা? আমি যে তোমাকে চারি দিকে খুজিয়া বেড়াইতেছি। এখানে একলা বসিয়া কেন?"

আনারউন্নিসা তাহার মুখের চিন্তাপূর্ণ ভাবটাকে গোপন করিয়া লইয়া, মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"কেন আমি কি কচি খুকী নাকি, যে জুজুতে আমায় ধরিয়া লইয়া যাইবে? এখন রাত কত হয়েছে জুমেলি?"

জুমেলি বলিল—"ঘণ্টা-ঘর থেকে প্রথম প্রহরের ঘণ্টা যে অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে। এখন ঘরে চল।"

আনার। নবাব সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন কি?

জুমেলি। তিনি এক বান্দাকে দিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন, যে আজ তাঁর আসিতে একটু বেশী রাত্রি হইবে। শাহজাদার সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রয়োজনীয় কি একটা কাজ আছে, সেই জন্য।

আনারউন্নিসার মুখখানা, এই কথাটা শুনিয়া অন্ধকারের মধ্যে একটু বিষণ্ণতামাখা হইয়া উঠিল। আনার পিছন ফিরিয়া

দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়া, জুমেলি তাহা দেখিতে পাইল না। এই জন্য রহস্য করিয়া বলিল, "একদিনের ঘণ্টা কয়েকের বিরহের জন্য অতটা কাতর হইলে চলিবে কেন? এখন— তোমার কক্ষে চল।"

দুজনে সেই স্বল্পান্ধকার রাশি মথিত করিয়া ধীরে ধীরে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল।

আনারউন্নিসা জুমেলিকে বলিল—"আজ আমার তবিয়ৎটা ভাল নয়। একটু সকাল সকাল শুইব। নবাব সাহেব ফিরিয়া আসিলে আমায় জাগাইয়া দিস্।"

জুমেলি বলিল—"তাহাই হইবে। এর মধ্যে তোমার যদি কোন প্রয়োজন হয়, আমায় ডাকিও। আমি তোমার পার্শ্বের কক্ষেই রহিলাম।"

জুমেলি চলিয়া গেল। আনারউন্নিসা, অন্ধকারময় হৃদয় লইয়া তাহার দীপালোকিত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিয়া, সেই দীপালোকের সম্মুখে একখানি গুলেস্তাঁ লইয়া পাঠ করিবার চেষ্টা করিল। পুস্তকে তাহার মন বসিল না। গ্রন্থখানি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া, সে চিত্তটাকে সরস করিবার জন্য তাহার বীণ্‌টা পাড়িয়া লইয়া চম্পকাঙ্গুলির সহায়তায় তাহার তারে দুই চারিবার মৃদু আঘাত করিল। কিন্তু বীণ্‌টা বড়ই বেসুরা। তাহার ঝঙ্কার বড়ই কর্কশ। সে বীণ্‌টাকে অশ্রদ্ধার সহিত সোফার উপর রাখিয়া, শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু বোধ হয় ঘুমাইতে পারিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এখন নবাব সুজা বেগ কোথায়, তাহা একবার আমাদের দেখিতে হইবে।

আগরা প্রাসাদের "হিরণমহলের" এক নিভৃত কক্ষমধ্যে বসিয়া চারিজন ওমরাহ গোপনে কি একটা জরুর ব্যাপারের আলোচনা করিতেছেন। এ কক্ষটী উপরের নয়, ভুগর্ভের মধ্যস্থ একটী গুপ্ত গৃহ। অবশ্য তাহার সাজসজ্জা ও উজ্বল আলোক-মালা দেখিলে, কেহ সহসা ধরিতে পারে না, যে সেটী "তয়খানা বা ভূগর্ভস্থ কক্ষ।"

এক সুন্দর স্বর্ণখচিত মখমলমণ্ডিত আসনে বসিয়া, এক দিব্যকান্তি পুরুষ। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে এক একটি সোফা অধিকার করিয়া, আরও তিনজন লোক সেই কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট। তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে, বোধ হয় তাঁহারা কোন উচ্চশ্রেণীর ওমরাহ।

প্রথমোক্ত দিব্যকান্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই সমাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা দারা। আর তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট এই তিনজন ওমরাহ, তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ।

এই কয়জনের মধ্যে একজন হইতেছেন, নবাব সুজা বেগ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সুজা বেগ বাদশাহী মুকিম বা রত্নবণিক। উত্তরাধিকারানুসারে পিতামহ ও পিতার পর, নবাব সুজা বেগই এখন এই গৌরবময় পদ পাইয়াছেন।

মোগল রাজত্বের সনাতন বিধানানুসারে, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারাই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা, তাঁহার সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রকাশ্যে না হইলেও, গোপনে গোপনে তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য দল বাঁধিয়াছেন।

এই তিন জনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কুমার ঔরঙ্গজেব। তিনি তাঁহার সহোদর, সম্রাটের অন্যতম পুত্র সুলতান মোরাদকে কলে কৌশলে তাঁহার আয়ত্ত্বাধীন করিয়া লইয়াছেন।

মধ্যম শাহজাদা শাহসুজা, এই সময়ে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মালেক। সরকারী শালতামামী কিস্তি বাদ, এই তিন মুলুকের সকল আয়ের উপস্বত্বের ও নজরাণার মালেক হইতেছেন তিনি।

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র দারা শেকো, বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানের অতি প্রিয়। তিনি জ্যেষ্ঠ—সুতরাং চাঘ্‌টাই মোগলদিগের কুলপ্রথানুসারে, তিনিই সিংহাসনাধিকারী। সম্রাট শাহজাহান বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া একটা মহা বিবাদ বাধিবে। এই জন্য তিনি ঔরঙ্গজেব ও মুরাদকে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে, আর শাহ সুজাকে বাঙ্গলা মুলুকের আধিপত্য দিয়া কৌশলে দূরে পাঠাইয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দারার সিংহাসন লাভের পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু হইলে কি হয়—চতুর ঔরঙ্গজেব, নিজের ধর্ম্মময় জীবনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া,পিছন হইতে এমন কুট চাল চালিতে ছিলেন—যাহাতে দিল্লীর রাজনৈতিক আকাশ দিনে দিনে আরও ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান দারা, শাহজাহানের প্রতিনিধি-রূপে হিন্দুস্থান শাসন করিলেও রাজকোষ আর দৌলতখানার চাবি, বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান নিজের হেফাজতে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং দারার খাস রাজকোষের উপর কোন আধিপত্যই ছিল না। তিনি সম্রাটের তহবিলের রক্ষক মাত্র।

সম্রাটের শরীর এদানীং বড় ভাল যাইতেছিল না। দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে, তিনি বড়ই ভুগিতেছিলেন। আর নিজে সকল সময় রাজকার্য্য দেখিতে পারিতেন না বলিয়াই, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারাকে একটা সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিলেন।

লাহোরে অবস্থানকালে, গুপ্ত প্রণিধিমুখে কোন জরুর গূহ্য-সংবাদ পাইয়াই, রাজকুমার দারা আগরায় চলিয়া আসিয়াছেন। সে সংবাদের সারকথা এই, তাঁহার ভ্রাতৃগণ সম্রাটের পীড়ার কথা শুনিয়া, রাজধানীর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। দারা বুঝিলেন, তাঁহার সহোদরগণের কার্য্যে বাধা দিতে হইলে, প্রচুর সেনাবল ও অর্থের প্রয়োজন।

প্রচুর অর্থ থাকিলে, সেনার অভাব হয় না। দারার মনের বিশ্বাস, তাঁহার নিকট যাহা আছে—তাহা প্রচুর নহে। আরও বার লক্ষ টাকা তাঁহার প্রয়োজন। এই জন্যই জ্যেষ্ঠ শাহজাদা

দারা, বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিয়াছেন। আর এই সভায় আহুত তিনজন ওমরাহই, তাঁহার অতি বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ সুহৃৎ।

তয়খানার সেই গুপ্ত মন্ত্রণা-কক্ষটীর দেওয়ালগুলি, লোহিত বর্ণে চিত্রিত। ইহার আসবাব—অর্থাৎ সোফা কৌচ ইত্যাদি যাহা কিছু, সবই লোহিতবর্ণের মখমল মোড়া। সেই লোহিতবর্ণের গৃহ আর গৃহসজ্জার উপর, লালরঙ্গের ফানুসের লাল আলো পড়ায় বোধ হইতেছিল কক্ষটী যেন—শোণিতরঞ্জিত।

সম্মুখে স্বর্ণখচিত বহুমূল্য সেরাজি পাত্র। কক্ষ মধ্যস্থ দীপাবলীর লাল আলো, এই রত্নমণ্ডিত পানপাত্রের গায়ে পড়ায় বোধ হইতেছিল, তাহার গাত্র বহিয়া যেন শোণিত ধারা পড়িতেছে।

কক্ষস্থ সকলে এক চতুরস্র আকারের লোহিত মখমলমণ্ডিত উচ্চ টেবিলের চারিদিকে বসিয়াছেন। এই টেবিলের উপর কোষমুক্ত স্বর্ণখচিত একখানি ক্ষুদ্র তরবারি। তাহার শাণিত ফলকের উপর লোহিতবর্ণের আলোকছটা পতিত হওয়ায়,তাহাও যেন রুধিরধারারঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেই তয়খানা মধ্যস্থ গুপ্তকক্ষের অবস্থা, সত্যই মনে একটা বিভীষিকাময় অবস্থা আনিয়া দিতে ছিল। তাহার দীপালোক লোহিতবর্ণের। কক্ষ গাত্রও লোহিতবর্ণের। আস্তরণ, মছলন্দ সোফা, দিবান, সবই রক্তবর্ণ মখমলের তৈয়ারি। আর যাঁহারা সেই কক্ষে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের গম্ভীর মুখ-

মণ্ডলে, দীপের লোহিতাভা পড়ায়, সেই চিন্তাগম্ভীর মুখগুলি আরও বিভীষিকাময়। রাজকুমার দারাই সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

"বড়ই এক সাংঘাতিক ব্যাপারের মন্ত্রণার জন্য, আমরা আজ এই কক্ষে সমবেত। এখানে যে তিনজন উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ মিত্র। সকলেই আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রতিশ্রুত। কিন্তু আজ হইতেই আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। দিল্লীর "ময়ুর-সিংহাসন" উত্তরাধিকার সূত্রে আমার। আমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার অন্য ভ্রাতারা যাহাতে সেনাবলে বলীয়ান হইতে না পারেন, তাহার বন্দোবস্ত আজই আমাদের করিতে হইবে। এই রক্তবর্ণ কক্ষের মধ্যে বসিয়া আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে, প্রয়োজন হইলে রক্তস্রোতে সাঁতার দিয়া আমরা বাদশাহী "তক্ত-তাউস" অধিকার করিব।"

"এ শোণিতোৎসবের মূল শক্তি প্রচুর অর্থ। আজ আমি আপনাদের প্রাণের দোস্ত বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। আপনারা এখনই এই তরবারি, আর আমার মস্তকের এই রত্নময় উষ্ণীস্, স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করুন—"সর্ব্বস্ব পণে আপনারা আমার সহায়তা করিবেন। আপনাদের জীবন-ধনসম্পত্তি, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, আমার দখলে থাকিবে।"

কথাগুলি শেষ করিয়া, সুলতান দারা তাঁহার মস্তক হইতে

বহুমূল্য রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ খুলিয়া সেই মখমলমণ্ডিত চতুষ্কোণ কাষ্ঠাধারের উপর রাখিলেন।

শাহজাদার কথা শেষ হইবামাত্রই, উপস্থিত তিনজন তখনই ভূমির উপর নত জানু হইয়া বসিয়া, সেই তরবারির ও শিরস্ত্রাণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সসম্ভ্রমে সেই তরবারি ও মুকুটটী স্পর্শ করিয়া বলিলেন "আজ হইতে আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই তরবারি ও শিরস্ত্রাণ যাঁহার—সেই শাহজাদা মালুকেমুলুক সুলতান মহম্মদ দারা শেকোর অধীনতা স্বীকার করিলাম। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য, তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

দারাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি বাক্য শেষ হইবামাত্রই, তাঁহার মুখমণ্ডল হর্ষপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুগন্ধি সেরাজি পূর্ণ একটী পান পাত্র তুলিয়া লইয়া, দারা সম্মুখের দিকে একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আজ আপনারা সর্ব্বস্ব বিনিময়ে আমার অন্তরঙ্গ মিত্র। এই মুকুট আর তরবারি, আমার গৌরবান্বিত পিতা সম্রাট শাহজাহান আমাকে জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান চিহ্নরূপে, সম্প্রতি উপহার দিয়াছেন। আপনাদের তিন জনের প্রদত্ত,এই দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা আমার আরব্ধ কার্য্যপথ খুবই প্রসারিত করিয়া দিবে। এক মহা বিপদ, মহা বিগ্রহ, আমাদের সম্মুখে। জীবন মরণ পণে, আমাকে বিজয়শ্রী লাভ করিতেই হইবে। যদি এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই—

যদি মোগলের "তক্ত-তাউস" আমার দখলে আসে—তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ আপনাদের। আর এই দ্বাদশ লক্ষ টাকা দ্বিগুণ করিয়া আমি আপনাদের প্রত্যর্পণ করিব। আর যদি তা না হয়—"

মির্জ্জা আস্কারী খাঁ, যিনি একজন মহাধনী ওমরাহ, এই সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শাহজাদা! খোদা আপনার মঙ্গল করুন। ও সব অমঙ্গলের কথা ভাবিবেন না। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—এ তক্ত-তাউস আপনার। এ হিন্দুস্থান আপনার। সম্রাটের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র আপনি। খোদা আপনার সহায়। অতি ভাগ্যবান না হইলে, সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে কেহ এই দুনিয়ায় আসে না।"

সুলতান দারা এ কথায় বিশেষ একটা আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের মত হিতকামী, একান্ত সুহৃদের প্রার্থনা, নিশ্চয়ই সেই মহিমাময় বিধাতার চরণে পৌছিবে। এস—এই রত্নময় পানপাত্র আজ আমাদের এই বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করিয়া দিক্। ভুলিয়া যাও তোমরা, যে আমি দিল্লীশ্বর শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভুলিয়া যাও তোমরা, যে খোদার ও মানুষের বিধানে আমি এই হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ মালেক! আজ হইতে মনে ভাবিও, তোমরা আমার দোস্ত আমিও তোমাদের একজন বই আর কিছুই নয়। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, তোমরা আমার—আমিও তোমাদের।"

এই কথা বলিয়া সুলতান দারা, সেই পান পাত্র নিঃশেষ

করিয়া—আবার তিনটী স্বর্ণ পাত্র স্বহস্তে সেরাজি পূর্ণ করিলেন। উপস্থিত সকলেই, বাদশাহ পুত্রের প্রসাদরূপে আবার এক এক পাত্র গ্রহণ করিলেন।

এই ওমরাহ তিনজনের মধ্যে, একজন সরকারী খাজনা খানার অধ্যক্ষ। তাঁর নাম মির্জ্জা আস্কারী বেগ। দ্বিতীয় ব্যক্তি নবাব সুজা বেগ—ইনি বাদশাহী মুকিম। তৃতীয় ব্যক্তি সম্রাটের খাস তোষাখানার হেপাজতকার মির্জ্জা হবীব। তিন জনেই প্রচুর অর্থবান—গননীয় ধনীশ্রেষ্ঠ ওমরাহ। তিনজনেই দারার অন্তরঙ্গ মিত্র। আর এই তিন জনেই তাঁহাদের সঞ্চিত সমস্ত ধন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দারার অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর মির্জ্জা আস্কারীই এ ক্ষেত্রে সকলের মুখপাত্র হইয়া, কথা কহিবার ভার পাইয়াছেন।

বার বার তিনবার সেই সুরা পাত্র পূর্ণ হইল। সেদিন পাত্র পূর্ণ করিবার জন্য বান্দা নাই, বাঁদী নাই, সাকিও নাই। কেননা ভুগর্ভস্থ এ গুপ্ত মন্ত্রণা গৃহে, মক্ষিকাটীর পর্য্যন্ত প্রবেশ নিষেধ।

ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সুলতান দারা বলিলেন—"এই মন্ত্রণা সভায় এইমাত্র শপথ অঙ্গীকারে তোমরা যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। আজ হইতে সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের প্রতিশ্রুতি মত সমস্ত ধনরত্নাদি আমার নিকট আসা চাই। আর একটা কথা অতি কষ্টের সহিত বিদায়ের পূর্ব্বে আমাকে বলিতে হইতেছে। আমার সহোদর-গণের উপর আমার তিলমাত্র বিশ্বাস নাই। যদি তোমাদের

তিনজনের মধ্যে, কেহ তাহাদের কাহারও প্রলোভন ও ছলনায় ভুলিয়া, আমার পক্ষ ত্যাগ কর, বা কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কর, তাহা হইলে—তোমরা আমার অতি সাংঘাতিক দুষমনের মধ্যে গণ্য হইবে।"

এই বলিয়া সুলতান দারা, রৌপ্যনির্ম্মিত একটী আধারের মধ্য হইতে লোহিতবর্ণের রেশমী রজ্জু ও একখানি রত্নখচিত শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিলেন—"এই রজ্জু—এই শাণিত ছুরিকা, বিশ্বাসঘাতকের চরম দণ্ড। আমার নিযুক্ত গুপ্ত ঘাতকগণের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই! আমার বন্ধুগণ এই কথাটা মনে রাখিয়া তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন ইহাই আমার শেষ অনুরোধ!"

সেই লোহিতবর্ণের রেশমী রজ্জু ও ছোরাখানি দেখিয়া সেই তিনজন ওমরাহ মনে মনে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

তারপর তাঁহারা যুবরাজ দারার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে আস্কারী খাঁ বলিলেন—"খোদা আমাদের নিমকহারামীর পাপ হইতে চিরদিনই রক্ষা করুন। শয়তানের ছলনায়, আমাদের চিত্ত যেন কখনও বিষাক্ত না হয়। কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট না হয়। স্থির মনে জানিবেন—শাহজাদা! যদি আপনার অভীষ্ট সাধনের জন্য আমাদের পথের ভিখারী হইতেও হয়, তাহাতেও আমরা প্রস্তুত। আপনার দৌলত, আমাদের দৌলত। আপনার বিজয়শ্রী, আমাদের বিজয়লাভ! আপনার পরাজয়ে আমাদের সমূহ সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন। আপনার অনেক নিমক

আমরা খাইয়াছি। আমাদের এ পদ ঐশ্বর্য্য সবই ত আপনার মেহেরবানে জনাবালি! আমরা আবার আপনার গৌরবান্বিত মুকুট ও তরবারি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—দেহে প্রাণ থাকিতে, আমাদের সঞ্চিত বিত্তের একটী কপর্দ্দক থাকিতেও, আমরা আপনার সহায়তা করিতে বিমুখ হইব না। "আল্লা-হো আকবর!" সেই ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ। আর হজরতই তাঁর প্রতিনিধি। আমরা তাঁহাদের নাম লইয়া জনাবের কার্য্যে জীবন সমর্পণের জন্য, বার বার তিনবার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলাম।"

বাদশাহী নহবৎখানা হইতে এই সময়ে দ্বিতীয় প্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সেই চন্দ্রালোকিত নিথর—মধু যামিনীতে, মধুর বেহাগের মর্ম্মস্পর্শী আলাপ শুনিতে শুনিতে, সকলেই শাহজাদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন। সকলেরই যান-বাহন সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল।

নবাব সুজা বেগ বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া, সরাসর অন্তঃপুরে গেলেন। তাঁহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন—এমন সময়ে জুমেলি কুর্ণীস করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুজা বেগ, ততরাত্রি পর্য্যন্ত জুমেলিকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া,বিস্মিতচিত্তে বলিলেন "এত রাত হইয়াছে—তবু তোমরা জাগিয়া আছ—জুমেলি! বেগমও তাহা হইলে আমার আশা-প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছেন?"

জুমেলি বলিল—"তাঁর তবিয়ৎটা আজ বড় ভাল নয়.

এজন্য একটু সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি ফিরিয়া আসিলেই তাঁকে সংবাদ দেওয়ার ভারটা আমার উপর দিয়াছেন বলিয়াই, আমি এখনও জাগিয়া আছি।"

নবাব সুজা বেগ, কি একটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"যখন বেগমের তবিয়ৎ ভাল নয়, তখন তাঁহাকে জাগাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আজ আমারও বড় ক্লান্তি বোধ হইতেছে এজন্য আমিও একটু নির্জ্জনে থাকিতে চাই। যাও—তুমি শয়ন করগে। রাত প্রায় একটা বাজে।"

জুমেলি কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, নবাব সুজা বেগ চিন্তা-কাতর হৃদয়ে, নিজের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার মনে একটা দারুণ অশান্তি জাগিয়া উঠিয়াছে।

নবাব সুজা বেগ, নিদ্রাহীন নেত্রে, চঞ্চলহৃদয়ে সেই কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। সবুজ বর্ণের সামাদানের মধ্যে কয়েকটী স্নিগ্ধ সুগন্ধি বর্ত্তিকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। ঐ কম্পন, ঠিক যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের তৎসাময়িক দ্রুত স্পন্দনের অনুরূপ। কি একটা দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার মুখ অতি মলিন। বাদশাহী বিলাসভোগ, উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য ইস্পাহানী সেরাজি, তাঁহার চিত্তে যে একটা প্রসন্ন ভাব আনিয়া দিয়াছিল, দারুণ দুশ্চিন্তার ফলে তাহাতে একটা অবসন্নভাব আসিল। তিনি চঞ্চল হৃদয়ে শয্যাশ্রয় করিলেন।

কিন্তু সে শয্যা যেন অনলকণাময়। ইস্তাম্বুলের সুগন্ধ সেই শয্যার উপাধানে ও আস্তরণে। কিন্তু তাহা হইতে যেন

নরকের তীব্র পূতিগন্ধ বাহির হইতেছিল। রাশিকৃত গুলাবগুচ্ছ এক স্ফাটিকময় ফুলদানীর উপরে ছিল। সে গুলাবের গন্ধও যেন অতি উগ্র।

সুজা বেগ—ব্যাকুল হৃদয়ে—অস্ফুটস্বরে সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হায়! আজ আমি আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়া, পথের ভিখারী হইলাম। আজ হইতেই আমার নবাবী লীলা শেষ হইল।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই, আনার বেগম তাঁহার প্রিয়সঙ্গিনী জুমেলিকে প্রশ্ন করিলেন—"নবাব সাহেব কাল বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি?"

জুমেলি বলিল--"হাঁ—তখন রাত্রি বোধ হয় একটা বাজিয়া গিয়াছে।

আনার। বড়ই বেয়াদব তুই। আমায় ডাকিস্ নি কেন? আমি ত তোকে বলেছিলুম—যত রাত্রেই তিনি আসুন না কেন, আমায় জাগিয়ে দিবি!

জুমেলি। তার অবসর পেলুম কই বেগম?

আনার। অবসর না পাবার কারণ?

জুমেলি। খোদ নবাব সাহেবের নিষেধ!

আনার। নিষেধ? কেন আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি?

জুমেলি। অপরাধ করা—করি নয়। সংসারে অনেক কাজ এমন ভাবে ঘটে যায়, যে তাতে অনেকে মনে ভাবে, তারাই অপরাধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপরাধ কারুরই নয়।

আনার। তোর ও সব বাঁকানো জ্ঞানের কথা, এখন তুলে রেখে দে। সত্য বল ব্যাপার কি?

জুমেলি। ব্যাপার কিছুই নয়। আমি বল্লুম—বেগমের তবিয়ৎ ভাল নয়, এজন্য তিনি একটু সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করেছেন। তাই শুনে তিনিও বল্লেন—যে তা হলে আর এতরাত্রে তোর বেগমকে জাগাবার কোন প্রয়োজন নেই—আমারও দেহ মন ভাল নয়!

আনার। কেন? কেন তাঁর মন ভাল নয় কেন?

জুমেলি। তা কেমন করে জান্‌বো বল? তবে—

আনার। তবে বলে থেমে গেলি যে?

জুমেলি। না, সে বাজে কথাটা তোমার শুনে কাজ নাই বিবি সাহেব! আমার জিভ্‌টা বড়ই অসামাল। সকল সময়ে ঠিক করে লাগাম দিয়ে রাখ্‌তে পারিনি। এজন্য অনেক বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়ে। অনেক সময় তোমার কাছে এজন্য বকুনিও খেয়েছি।

জুমেলির মুখে সেই ভাবের কথা শুনিয়া, কি একটা অব্যক্ত সন্দেহের পীড়নে, আনারের প্রফুল্লমুখ খানি যেন একটু মলিনাভ

হইয়া পড়িল। সে তখনই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, "তবে—বলে থেমে গেলি যে? তোর এই "তবের" শেষটা আমাকে শুনতেই হবে।"

বিধাতার বিধানে, নারীর পেটে কখনই কোন কথা বেশীক্ষণ লুকোনো থাকে না। কি একটা কথা বলিবার জন্য, জুমেলি খুবই ব্যাকুল। অথচ তার মনে একটা ভয়ও ছিল, যে পাছে আনারউন্নিসা সে কথা শুনিলে মনে কষ্ট পান। জিহ্বাকে সংযত করিতে না পারায়, সে যে একটা মহা ভূল করিয়া বসিয়াছে, আনারের মুখের মলিন ও গম্ভীর ভাব দেখিয়াই সে তাহা বুঝিয়া লইল। এজন্য সে কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল—"তোমার কেমন একটা একগুঁয়ে স্বভাব—যে খুব একটা ছোট কথা, তোমার কাণে উঠলে সেটা আর সহজে ভুলতে চাও না। বলি যে কথাটা শুনলে তোমার কোন লাভ নেই, তার জন্য এত পীড়াপীড়ি কেন?"

আনারউন্নিসা কোনমতেই তাহার নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিল না দেখিয়া, জুমেলি প্রকারান্তরে বলিয়া ফেলিল—সে যেন নবাব সাহেবের মুখে গতরাত্রে সেরাজির গন্ধ পাইয়াছিল!

কথাটা শুনিবামাত্রই, আনারউন্নিসার হৃদয়ে কাল মেঘের সঞ্চার হইল। সন্দেহের বাতাসে খুব জোরে পরিচালিত হইয়া, সেই খণ্ড মেঘগুলি একত্র জমায়েৎ হইয়া, যেন একটা মহাঝড়ের সূচনা করিল।

স্বামীর চেয়ে রমণীর পক্ষে বিশ্বাসের পাত্র এ দুনিয়ায় আর

কেউ তো নাই। কিন্তু স্বামীর প্রতি, তাঁহার কার্য্যের প্রতি, যেথানে একবার সন্দেহ আসিয়া জুটে, সে সন্দেহের কঠিন পাশ ছিন্ন করা, অনেক রমণীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সে দিন মধ্যাহ্নে বাহারবান্থর যে ঘটনাটা আনারের চোখের উপর ঘটিয়া গেল—তাহার কষ্টকর স্মৃতি, এখনও তাহার চিত্তপট হইতে অপসারিত হয় নাই। এখন সুযোগ পাইয়া, পূর্ব্ব সঞ্চিত সেই সন্দেহান্ধকারটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

সুতরাং আনারউন্নিসা মনে মনে একটা সহজ সিদ্ধান্ত করিয়া লইল,যে শাহজাদার সহিত কাজ থাকার অছিলাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা! নবাবের আদরিণী বাহারবান্থু, কাল আমার কাছে খুবই অপমানিত হইয়াছিল। তাহার মান ভাঙ্গিবার জন্য, তিনি নিশ্চয়ই আরামবাগে গিয়াছিলেন। আর সেইখানেই আনন্দে উল্লাসে আর সেরাজি পানে, নবাব সাহেবের অর্দ্ধেক রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে যে সেরাজি ব্যবহার করিব না বলিয়া, তিনি তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা, গত রজনীতে এই স্বৈরিণীর মোহকরী ছলনার শক্তিতে খুবই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ একটা বিকৃত সিদ্ধান্ত করিয়া, অভিমানিনী আনারউন্নিসা, স্বামীর উপর বড়ই ক্রুদ্ধা হইল। একটী রাত্রের অদর্শনজনিত একটা আকুল দর্শনাকাঙ্ক্ষা, তাহার হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে নবাবের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু জুমেলির মুখে এই সব কথা শুনিয়া, সে নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল।

আর জুমেলি ? সে আনারউন্নিসার মুখে একটা অতি অপ্রসন্ন ও মহাবিরক্তির ভাব দেখিয়া বুঝিল, তাহার অসাবধানতার ফলে নবাব-বেগম আনারউন্নিসা, মনে বড়ই একটা কষ্ট অনুভব করিয়াছেন! সে ভাবিল—কথাটা বলিয়া সে খুবই অন্যায় করিয়াছে।

সে আনারের স্বভাব জানিত। সুতরাং এ সময়ে তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করার চেষ্টা নিস্ফল হইবে ভাবিয়া, সে আপনার কাজে চলিয়া গেল।

নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে বসিয়া, আনারউন্নিসা নিজের চিন্তায় বিভোরা। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—"দাস দাসী, বান্দা বান্দা, এল্‌বাব পোষাক, হীরা মতি ও জড়োয়ার অলঙ্কারই কি রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ? হীনচরিত্র কলুষিত স্বভাব স্বামীর পত্নী হওয়ার কি এত বেশী মর্ম্ম জ্বালা?"

"নবাব সুজা খাঁর গুপ্ত জীবনের সব কথাই তো সে শুনিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত বিবাহের পর হইতে সে যে তাঁহার কলঙ্ক মাখা অতীত জীবনের সকল কথাই ভুলিয়া আসিতেছিল! সুখ সৌভাগ্যের উজ্জ্বল রশ্মি-প্লাবিত, বর্ত্তমানকে লইয়াই যে সে এই বিশাল প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার মধ্যে, এক নূতন বেহেস্তের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছিল! সে যে ভাবিয়াছিল,—তাহার জীবনের নিশিদিন গুলি, সুখ স্বপ্নমাখা সঙ্গীতে বিভোর হইয়া থাকিবে। হায়! তবে কেন তাহার সুখময় জীবন স্রোতে এ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল?"

আনার যখন এইরূপ হৃদয় বিপ্লবকারী চিন্তায় মুহ্যমানা, সেই সময়ে নবাব সুজা বেগ, তাঁহার পত্নীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আনারউন্নিসা! তুমি এখন কেমন আছ?"

অবনতমুখে আনার নিজের চিন্তাতেই বিভোরা ছিল। সহসা স্বামীর কণ্ঠস্বরে তাহার অর্দ্ধলুপ্ত চেতনা, যেন জাগরণের সীমায় ফিরিয়া আসিল। নবাব সুজা বেগ, যে তাহাকে এইমাত্র একটা কি প্রশ্ন করিলেন—তাহা সে ভালরূপ বুঝিতে পারে নাই। এইজন্য বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে একবার মাত্র স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, সে আবার মুখ অবনত করিল।

নবাব সুজা বেগ, আনার চরিত্রের বৈচিত্রতা কি—এই কয় মাস ব্যাপী দাম্পত্য—জীবনেই ভালরূপ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি বুঝিলেন—"কাল রাত্রে আনারের সহিত দেখা না করায়, সে দারুণ অভিমানিনী হইয়াছে। তাই কথা কহিতেছে না।"

তিনি পার্শ্বে বসিয়া, পত্নীর এলায়িত কুঞ্চিত কেশগুলি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন। আনার বলিল,—"আমার এমন কি হইয়াছে—যাহার জন্য তুমি এতটা ব্যাকুলভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছ?"

সুজা খাঁ বলিলেন—"কাল রাত্রে জুমেলির মুখে শুনিয়াছিলাম তোমার তবিয়ৎ ভাল ছিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

আনার। যদি আমার উপর তোমার এতই টান, তাহা হইলে অসুখের কথাটা শুনিবার পর একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া

আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেই, হয়তো অসুখের সংবাদটা কাল রাত্রেই পাইতে।

নবাব সুজা বেগ বুঝিলেন—কথাগুলিতে দারুণ অভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছে। এজন্য আনারের হাতখানি তাঁহার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাহার উপর মৃদুভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"অবশ্য সেটা করা আমার উচিত ছিল বটে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা নানা কারণে কাল একটুও ভাল ছিল না। আর বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া, তোমায় আর ত্যক্ত করি নাই।

আনার। কেন? সহসা তোমার এ মনের অসুখের কারণ কি? আমার বলিতে কোন বাধা আছে কি?

সুজা। তুমি এখন তাহা নাই বা শুনিলে আনার-উন্নিসা?

আনার। আমি তোমার ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নী। তোমার সুখ দুঃখের সমান অংশভাগিনী। তোমার যাহাতে মনের অসুখ ঘটিয়াছে, তাহা শুনিলে হয়তঃ আমার সাধ্যমতে তাহার প্রতিকারের কোন না কোন চেষ্টা করিতে পারি।

সুজা। না—আমায় এ আগন্তুক মহাদুঃখের প্রতিকারের কোন ক্ষমতাই তোমার নাই। এ দুঃখ—বিধাতা প্রেরিত। এক খোদা ভিন্ন, এ সময়ে কেহই আমার প্রাণে শান্তি দিতে পারেন না। কি বিপদে যে আমি পড়িয়াছি,তাহা যদি কখনও তোমাকে বলিবার প্রয়োজন হয়, জানিও স্বেচ্ছায় আমি তাহা করিব।

এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা অনেক সময় কোমল হৃদয়া পত্নীর নিকট ব্যক্ত করাও সুবুদ্ধির কাজ নয়।"

সত্য সত্যই অতীত রজনীর সেই ব্যাপারটা, সেই রক্তবর্ণ গুপ্ত কক্ষের স্মৃতি,সুজাবেগের মনে বড়ই একটা দুর্নিমিত্তের ছায়া আনিয়াছিল। যাহা কিছু সেখানে হইয়া গেল, সবই যেন স্বপ্নের মত। তিনি সুলতান দারার তরবারি ও মুকুট স্পর্শ করিয়া এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। যে উপায়ে হৌক, এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাকে চারি লক্ষ টাকা শাহজাদার হাতে তুলিয়া দিতেই হইবে। দিলে—ঘোর দারিদ্র, আর না দিলে অপমান—লাঞ্ছনা কিম্বা দারার গুপ্ত ঘাতকের হস্তে শোচনীয় মৃত্যু! অথচ এ ভয়ানক গুপ্ত কথা কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিবার বা কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসার উপায় নাই। বিশ্বাস-ভাজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কিম্বা একাত্মহৃদয়া স্নেহময়ী পত্নী, কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া এই ভয়ানক কথা বলিতে সাহসে কুলায় না। এ সাংঘাতিক ব্যাপারের কথা বাহিরে ব্যক্ত হইলেই, যাহা দ্বারা হইয়াছে, তাহার শোচনীয় মৃত্যু ভীষণ নির্য্যাতন, অতি নিশ্চিত—অব্যর্থ।

ধরিতে গেলে, নবাব সুজা খাঁ প্রকারান্তরে তাঁহার পত্নীর নিকট সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সন্দেহ জিনিষটা বড়ই ভয়ানক। বাহারবানুর ব্যাপারে, আনারের মনে একটা দারুণ সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সন্দেহ বশেই অভাগিনী আনারউন্নিসা মনে মনে ভাবিয়া লইল—এটা বাহারবানু সম্পর্কীয়

ব্যাপার না হইয়াই যায় না। নবাব ইচ্ছা করিয়াই তাহার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছেন।

নবাব সুজা বেগ কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আনার! আজ হইতে দুই চারি দিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমি সরকারী প্রয়োজনে, এখনই আজমীর যাইতেছি। ফিরিতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইতে পারে। খুব সাবধানে থাকিবে তুমি—এই কথা জানাইয়া তোমার নিকট বিদায় লইতেই আমি আসিয়াছিলাম।"

আর কোন কিছু না বলিয়া, বা তাঁহার পত্নীকে কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই, নবাব সুজা বেগ সহসা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দুষ্টবুদ্ধিচালিতা আনারউন্নিসা ভাবিল—"পাছে জেরার মুখে প্রকৃত কথা বাহির হইয়া পড়ে, এইজন্যই নবাব সাহেব একটা অছিলা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।"

সে অস্ফুট স্বরে কেবলমাত্র বলিল—"হায়! এই কি জীবনের সুখ! পতির অনুরাগিণী পত্নী হইয়াও যখন তাঁহার একান্ত বিশ্বাসের পাত্রী হইতে পারিলাম না, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নবাব সুজা বেগ আর তাঁহার পত্নী আনারউন্নিসার সাহচর্য্য ছাড়িয়া, বাহারবানু কোথায়—এবং কি করিতেছে, তাহার একবার সন্ধান লইতে হইবে।

আগরা সহরের নিভৃত প্রান্তে, একখানি ছোট খাট, সুন্দর সাজানো, সুপরিচ্ছন্ন অট্টালিকায় বাহারবানুর নিবাস।

এ বাড়ীতে আর কেহই থাকে না। কেবল বাহারবানু আর তাহার বান্দা বাঁদীগণ। আর এ সব বান্দা বাঁদীর সংখ্যা বেশী নয়। তিন চারি জন মাত্র!

একটী নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, বাহার এক হস্তীদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বাক্স হইতে, কতকগুলি পত্র বাহির করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পড়িতেছিল। সে পত্রগুলি পড়িবার সময়,কখনও তাহার মুখে ঘৃণা পূর্ণ হাস্য প্রকটিত হইতে লাগিল, আবার কখন ও বা তাহার সেই সুন্দর মুখখানি ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, সযত্নে পঠিত এই কাগজগুলি নবাব সুজা বেগের পুরাতন প্রেমপত্র।

পত্রগুলি বেশ করিয়া সাজাইয়া, একটী রেশমী সুতার দ্বারা বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া, আর একটী বাক্স নিকটে টানিয়া লইয়া সে তাহার ডালা খুলিল। এই দ্বিতীয় বাক্সের ভিতরে যাহা কিছু কাগজ পত্র ছিল—সবই বাহির করিয়া ওলট-

পালট করিয়া দেখিল। কিন্তু যে কাগজ কয়খানিতে তাহার খুব প্রয়োজন তাহা না পাওয়ায়, তাহার মুখখানা ক্রমশঃ চিন্তা মলিন হইয়া উঠিতেছিল।

একবার, দুইবার তিনবার খুঁজিবার পর, সে একটী কারুকার্য্যময় লম্বা আকারের চাঁদীর আধারের মধ্যে, কয়েকখানি লোহিতবর্ণের কাগজ দেখিতে পাইল। সেগুলি খুলিয়া পড়িবামাত্রই, সে মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ইয়ে মেরে খোদা মেহেরবান্! ধন্য তোমাকে! এইবার তুমি যাও কোথায় নবাব সুজা বেগ! এই পত্রের সহায়তায় আমি এক ঢিলে দুই পাখী মারিব। যে আনারউন্নিসা গর্ব্বভরে আমার অপমান করিয়াছে, তাহার নবাব-পত্নী হওয়ার দর্পচূর্ণ করিব। তোমাকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমার গোলামের গোলাম করিব। শয়তান্! বিশ্বাসঘাতক! শয়তানী নারীর শক্তি যে কত বেশী, তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই।"

এমন সময় এক বান্দা আসিয়া সেলাম করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাহার বলিল—"খবর কি বান্দা?"

"নবাব সুজাখাঁর বাড়ী হইতে এক পত্র আসিয়াছে" বলিয়া সেই বান্দা এক খানি পত্র বাহার বানুর হাতে দিল।

নবাব সুজাখাঁর নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে শুনিয়া, বাহারবানু মনে ভাবিল, যে এইবার সাধাসাধির পালা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং খুব একটা কৌতুহলবশে, সে পত্রখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। পত্রখানি পড়া শেষ হইলে,

বাহার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে সেখানি হাতে লইয়া কক্ষমধ্যে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল! তাহার এরূপ বিস্মিত হইবার একটু কারণ আছে।

কথিত পত্রখানি, নবাব সুজাবেগের নিকট হইতে আসে নাই। আসিয়াছে—তাঁহার বেগম আনারউন্নিসার নিকট হইতে। বাহারের বিস্ময়ের কারণ এই,যে আনার-উন্নিসা একদিন দর্পভরে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আজ সে কি না তাহাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছে।

আনার-উন্নিসার সেই পত্রে লেখা ছিল,—"বহিন্! এ সংসারে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া যায়, যাহার উপর মানুষের কোন হাতই থাকে না। সে দিন আমি না বুঝিতে পারিয়াই তোমার সহিত ওরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম। এজন্য কিছু মনে করিও না। আমায় মার্জ্জনা করিও। আজ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করিবে। নবাব সাহেব এখানে নাই। জরুর সরকারী কাজের জন্য তিনি আজমীরে গিয়াছেন। সুতরাং তোমাকে দুটো মনের কথা বলিবার বিশেষ সুবিধাই ঘটিবে। এ পত্রের উত্তর দিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ধরিয়া রাখিলাম, যে তোমার শুভাগমনই এ পত্রের উত্তর। আমায় নিরাশ করিও না। না আসিলে বুঝিব, তুমি এখনও আমার উপর অসন্তুষ্ট—আনার-উন্নিসা।"

বাহার পত্রখানি আবার পড়িল। তাহার মুখখানা আবার

হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, আনার-উন্নিসা বড়ই দুর্ব্বল চিত্তা রমণী। এবারেও তাহার বাজী জিৎ হইয়াছে।

পরক্ষণেই তাহার মনে একটা সন্দেহের ছায়া দেখা দিল। সে ভাবিল—"আনার-উন্নিসার এমন কি কথা—তাহার সঙ্গে থাকা সম্ভব, যাহার জন্য সে তাহাকে আজ এতটা বিনীত ভাবে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে! যাহাই হউক না কেন, ব্যাপারটা যে কি, তাহা একবার আমায় দেখিতে হইবে।"

বাহারবানু সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যথা সময়ে তাহার সেই ঈপ্সিত সন্ধ্যা আসিল। সে ভৃত্যকে বলিয়া এক বলবান অশ্বযোজিত বিচিত্র শিগ্‌রামে সওয়ার হইয়া, নবাব সুজাখাঁর বাটীর উদ্দেশে চলিল।

আনার জুমেলিকে ইতি পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিল, বাহারবানু আসিলেই,সে সরাসর তাহাকে উপরের কক্ষে তাহার নিকটে লইয়া যাইবে।

আনার সে দিন ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়াছে। তাহার যে অঙ্গে যা ধরে, সেই সব বহুমূল্য অলঙ্কারে সে সজ্জিতা। ফিরোজা রঙ্গের এক সুন্দর সাঁচ্চা শাড়ী, তাহার উপর সেই রঙ্গেরই আঙ্গরাখা ও ওড়না। কণ্ঠদেশে বিলম্বিত নবাব সুজাখাঁর প্রদত্ত নূতন হীরার হার। এই হার ছড়াটীর দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই হারের উজ্জ্বল হীরকগুলির উপর কক্ষ মধ্যস্থ অসংখ্য দীপের আলোকছটা পড়ায়, আনার যেন সর্ব্বোজ্জ্বলকান্তিময়ী অপ্সরার মত দেখাইতেছিল। বলা বাহুল্য,

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চালিত হইয়াই, আনার-উন্নিসা এই ভাবে বেশ ভূষা করিয়াছিল।

বাহারবান্থকে কক্ষ মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া, আনার-উন্নিসা তাহার হাত ধরিয়া অতি যত্নের সহিত এক সোফার উপর বসাইয়া বলিল,—"সে দিন আমাদের উভয়েরই বুঝিবার দোষে একটা বড়ই অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল। এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত বহিন্!"

বাহার—প্রথমতঃ বিস্মিত হইল, আনারের সমুজ্জ্বল বেশ-ভূষা দেখিয়া। তারপর সে দেখিল, সে দিনের সেই রুক্ষ প্রকৃতি আনার-উন্নিসার পরিবর্ত্তে, সে এক শান্তমূর্ত্তি স্বর্ণপ্রতিমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। সে স্বর্ণ-প্রতিমা স্ফুরিতাধরা, হাস্যময়ী, ও অতি মিষ্টভাষিণী।

মনের ভাব গোপন করিবার শক্তি, বাহারবান্থকে বিধাতা যথেষ্টই দিয়াছিলেন। সুতরাং সে আদব-কায়দার সহিত তাহার সুন্দর হাতখানি তুলিয়া, আনারকে একটী ছোট খাট কুর্ণীস করিয়া সহাস্যমুখে বলিল,—"আমারও সে দিনের ঘটনাটার জন্য মনে বড়ই একটা অনুতাপ জন্মিয়াছে। এ অধিনীকে স্মরণ করিয়াছেন কেন বেগম?"

আনারউন্নিসা বাহারের সম্মুখস্থ একখানি আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বাহারের মুখভাব উত্তমরূপে লক্ষ্য করাই, বোধ হয় তাহার মনের গূঢ় উদ্দেশ্য।

আনার উন্নিসা আর ভূমিকা না করিয়া বলিল,—"তোমাকে

একটা কথা বলিবার জন্য আজ আমি ডাকিয়াছি। আশা করি, সরলভাবে— উদার হৃদয়ে, তুমি আমার কথাগুলি বিবেচনা করিবে।"

বাহার বানু এ ভূমিকায় যেন একটু আশ্চর্য্যবোধ করিল। তবুও সে বলিল—"বলুন আপনার কি কথা? আমি তাহা শুনিতে খুবই প্রস্তুত।"

আনার উন্নিসা বলিল,—"পত্নীর একটী দায়িত্বময় কর্ত্তব্য আছে। আমার সেই কর্ত্তব্য পালনের পথে তুমিই একমাত্র অন্তরায়। আমি চাই নবাবকে ষোল আনা দখল করিতে। কিন্তু তুমি আগরায় থাকিতে, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার পক্ষে কোন সম্ভাবনা নাই।"

বাহারবানু বলিল,—"আপনি আমাকে এ জন্য কি করিতে বলেন বেগম সাহেবা?"

আনার উন্নিসা। তুমি আগরা ছাড়িয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাও। তোমাকে এজন্য কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে না। চিরদিনের জন্য নয়, কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ তুমি নবাব সুজার্থার চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও। আজ আমি যে সব জহুরতের গহনা পরিয়াছি, তাহার মূল্য এক লক্ষ টাকা। এই হীরকহার ও তৎসঙ্গে সবই আমি তোমায় এখনি খুলিয়া দিতেছি! এই লক্ষ টাকার বিনিময়ে, তুমি আমার এ অনুরোধটী ছয় মাসের জন্য রাখিতে পারিবে না?"

আনার একটা আকুল আগ্রহবশে, বাহারবানুর হাত দুই

খানি ধরিয়া ফেলিল। তাহার উচ্ছ্বাসময় হৃদয়ে তখন মহা ঝটিকা উঠিয়াছে। এক হীনা স্বৈরিণীর নিকট, সে দীনার মত এই ভিক্ষা চাহিতেছে। সে আশা যদি পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তার অপমানের বাকী রহিল কি? বাহার বানুর "হাঁ ও না" এই দুটী কথার উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সম্পদ, আনন্দ উল্লাস সবই নির্ভর করিতেছে!

বাহারবানু. আনারউন্নিসার এ অদ্ভুত অনুরোধে খুবই বিস্মিতা হইয়া পড়িয়াছিল। সে আনারের মনোভাব পরীক্ষার জন্য বলিল—"যদি আমি এ প্রস্তাবে স্বীকৃতা না হই?"

আনার উন্নিসা বিস্মিতভাবে বাহারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাহাহইলে বুঝিব, রমণীরূপে তুমি রাক্ষসী। মূর্ত্তি-ময়ী শয়তানীরূপে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

বাহাঁর বানু মনে মনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিল, "আমি না হয় আগরা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু নবাব সুজার্খা আমার স্মৃতি ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন কি?"

আনারউন্নিসা বলিল—"তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। তার পর আমি বুঝিব, নবাব সুজাখাঁ তোমাকে ভুলিতে পারেন কি না? আমার পত্নীত্বের শক্তিতে আমি যদি তাঁহার মনে তোমার স্মৃতির বিস্মৃতি না ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি প্রতিশ্রুতি মুক্ত। আমি আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই নিশ্চিন্ত হইব।"

বাহারবানু মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। আনার

উন্নিসা—এই মৌনকে সম্মতি চিহ্ন মনে করিয়া, তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিতে লাগিল।

বাহারবানু আনারের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল,—"কি তুমি সামান্য এক লক্ষ টাকার প্রলোভন আমায় দেখাইতেছ—আনার বেগম! এ বাহারবানুকে পুরুষে যখন এ পর্য্যন্ত চিনিতে পারে নাই—তা তুমি অতি দূরে! জাননা তুমি—যে নবাব সুজাখাঁর মৃত্যুবাণ আমার হাতে। তাঁহার মরণ বাঁচন আমার হাতে। তোমার ধৃষ্টতা একবার সহ্য করিয়াছি, এবারও করিলাম। সুজাখাঁ আমার এই মুষ্টি মধ্যে থাকিলে, কত 'এক লক্ষ টাকা' আমার ঘরের মেঝেয় গড়াগড়ি যাইবে।"

এই সময় মধ্যে আনারের অলঙ্কার খোলার ব্যাপারটা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার সম্মুখস্থ একটী হস্তীদন্ত নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় ক্ষুদ্র হাতবাক্সে, সেই অলঙ্কারগুলি রাখিয়া তাহার ডালা বন্ধ করিয়া সে বাহারবানুকে বলিল "বাহারবানু! আনন্দে আমি এগুলি তোমায় দিতেছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—

বাহারবানু। কি প্রতিজ্ঞা করিব?

আনারউন্নিসা। আজ হইতে তিন দিনের মধ্যে তুমি আগরা ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাইবে।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আনারউন্নিসা একটী রেশমী থলিয়া বাহারের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"ইহাতে এক সহস্র মুদ্রার আসরফি আছে। ইহা তোমার পাথেয়।"

বাহারবানু, আনারের এ প্রস্তাবে মৃদু হাস্য করিল। সে হাসি ঘোর বিদ্রুপমাখা! সে হাসিতে যেন একটা কঠোর উপেক্ষার ভাব পরিস্ফুট।

আনার বলিল—"হাসিলে কেন?"

বাহার। তোমার প্রস্তাব অতি অসঙ্গত—অতি অসম্ভব!

আনার। তাহা হইলে তুমি আগরা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে যাইতে সম্মত নও?

বাহার। না—কোন মতেই না। দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য যদি তুমি আমাকে প্রদান কর,তাহা হইলেও নয়! নবাব সুজা বেগ কোন মতেই আমার কবল মুক্ত হইতে পারেন না। আমি হিন্দুস্থানের অতি সুদূর প্রান্তে চলিয়া গেলেও, এমন একটী ভীষণ ব্যাপারে তিনি জড়িত, যে আমার সাহায্য না পাইলে তাঁহার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই তাঁর নাই! তুমি সে দিন আমায় যথেষ্ট অপমান করিয়াছ। আর এ দর্পিত প্রস্তাব করিয়া আজও অপমান করিলে। ভাগ্যপরীক্ষার্থে আমি ইরান ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে আসিয়াছি। তোমার উপকারের জন্য আমি আমার নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিব কেন?"

এই কথা বলিয়া, আনারের দিকে তীব্র ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বাহারবানু বলিল—"আমরা জাতিতে শিরিয়ান আরমানী। অপমানের প্রতিশোধ কি করিয়া লইতে হয়, তাহা আমরা জানি। তোমার কৃত এ অপমান এ উপেক্ষা, ভাবিও না তুমি আমি বিনা প্রতিশোধে ভুলিয়া যাইব। তবে এই টুকু

তোমায় বলিয়া রাখি—"আমার জীবন থাকিতে তুমি নবাব সুজাবেগকে কোন মতেই পাইবে না।"

বাহারবানু তাহার কথাগুলি শেষ করিয়া, অতি দ্রুতপদে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া পুরীর বাহিরে চলিয়া আসিল। আনার উন্নিসা, তাহার কথাগুলি শুনিয়া অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। সে আর কোন কিছু বলিবার অবসর পাইল না। দূর্ভাগ্য ক্রমে জয় পরাজয়ের কঠোর সংগ্রামে, বার বার তিনবার তাহার বাজি হার হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন আমরা মীর লতিফের কোন সংবাদ পাই নাই। একবার তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

সাধু ফকির জুম্মাশার উপদেশে, বহুদিনের সুখময় স্মৃতিকে বিস্মৃতির অনলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, সে অতি দূর দেশে চলিয়া গিয়াছিল।

আনারকে দেখিবার জন্য, তাহার মনে খুবই একটা উৎসুক্য জাগিয়া উঠিল। সে ঔৎসুক্য—সে কোন মতেই দমন করিতে পারিল না। সেই আনার উন্নিসা—এখন না জানি দেখিতে কেমন সুন্দর হইয়াছে, তাহার রূপপ্রভা দশদিক আলো করিয়া, প্রভাত সূর্য্যকিরণের মত চারিদিকে কতই না জ্যোতি ছড়াইতেছে, একটা বৃহৎ সংসারের গৃহিণীরূপে সে কি ভাবে

সংসার চালাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য তাহার বড়ই একটা ঔৎসুক্য জন্মিল। এই জন্য সে এক সপ্তাহের অবসর লইয়া চুপি চুপি আগরায় আসিয়াছে।

জামাল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মীর লতিফ্ আনার-উন্নিসার সম্বন্ধে সকল সংবাদই পাইল। নবাব-পত্নী হইবার একমাস মধ্যেই, আনার নবাব সুজাবেগের প্রাসাদতুল্য ভবনে চলিয়া গিয়াছে। তাহার চেষ্টায় যত্নে, পত্নীর কর্ত্তব্যে, নবাব সুজা বেগ এখন কলুষিত স্বভাব ত্যাগ করিয়াছেন। দুষ্ট লোকের সাহচর্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আর আনারের শৃঙ্খলায় ও সুব্যবস্থায়, নবাবের সংসারে একটা নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কথাগুলি শুনিয়া, মীর লতিফের বুকটা যেন দশ হাত স্ফীত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"আনার! তোমাকে আজও আমি ভালবাসি। স্বার্থত্যাগেই ভালবাসার মহত্ত্ব। তুমি সুখে আছ, ইহা শুনিয়া যে আমার সুখ! তুমি চিরদিন এইরূপ সুখে থাক, ইহাই আমার কামনা। আমি জানি খোদা তোমাকে অপূর্ব্ব স্পর্শমণিরূপে সৃজন করিয়াছেন। যে তোমার সাহচর্য্যে আসিবে, সে পিতল হইলেও সোনা হইবে।

সে মোটে সাতটী দিন আগরায় থাকিবে। কিন্তু এর মধ্যে একবার আনারের সঙ্গে তাহাকে সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। এই ইচ্ছাটা সে কোন মতেই দমন করিতে পারিল না।

জামাল খাঁর নিকট বিদায় লইয়া সে মনে ভাবিল—"নবাব

সুজাখাঁর প্রাসাদ ত বেশী দূরে নয়। একবার দেখিয়া গেলে হয় না কি ?"

তাহার মনে বড়ই একটা সংকোচময় লজ্জার ভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু আনারকে দেখিবার একটা অতি প্রবল বাসনা, এই সংকোচকে মাঘের কুয়াসার মত তখনই উড়াইয়া দিল।

সে নবাব সুজাখাঁর ভবনের উদ্দেশে চলিল। বাড়ীর নিকটস্থ হইবামাত্রই, ভবিতব্য প্রেরণায়—জুমেলির সহিত তাহার দেখা হইল। জুমেলি তখন সংসারের একটী ফরমায়েস লইয়া বাহিরে যাইতেছে।

মীর লতিফ প্রথমতঃ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা এই জুমেলিকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু জুমেলি তাহাকে দেখিবামাত্রই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিল—"বন্দেগি! জনাব মীর লতিফ সাহেব! লাহোর হইতে আপনি কবে ফিরিলেন ?"

মীর লতিফ জুমেলিকে দেখিয়া খুব সুখী হইল। সে মনে মনে ভাবিল—খোদা তাহার সহায়। তাহা না হইলে এই জুমেলি সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে কেন ?

মীর লতিফ সহাস্য মুখে বলিল—"ভাল আছ ত জুমেলি ? তোমার বিবি ভাল আছেন ত ? বোধ হয় তোমরা আমার কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছ।"

জুমেলি সহাস্য মুখে বলিল—"না—সাহেব! তা নয়! আপনার মত লোককে ভুলিয়া যাওয়া সহজ কাজ নয়। কালই

নবাব বেগম আপনার কথা বলিতেছিলেন। বাস্তবিক আপনি বড় নিষ্ঠুর!

মীর লতিফ। কেন? আমার অপরাধ?

জুমেলি। চিঠি পত্রের আদান প্রদান বন্ধ করিলেন কেন? কুশল সংবাদের আদান প্রদানে দোষ কি?

মীর লতিফ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তা বটে—কিন্তু এখন আর এরূপ পত্র ব্যবহারটা সঙ্গত নয়।"

চতুরা জুমেলি, মীর লতিফের মনের কথা বুঝিয়া ও সম্বন্ধে আর কোন কিছু বলিল না। কেবল মাত্র বলিল—"আপনি এখন আগরাতেই থাক্‌বেন ত?"

মীর লতিফ। না—সরকারের জরুরি পত্রবাহক রূপে এক-খানি গোপনীয় পত্র আমাকে সুলতান দারার নিকট আনিতে হইয়াছে। পত্রের জবাব বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যে পাইব। জবাব পাইলেই আমাকে লাহোরে চলিয়া যাইতে হইবে।"

জুমেলি মুহূর্ত্ত মাত্র কি ভাবিয়া বলিল—"বেগমের সহিত একবার দেখা করিবেন না?"

মীর লতিফের মুখমণ্ডল আরক্ত ভাব ধারণ করিল। আনারউন্নিসার সহিত দেখা করিতে তাহার সাহস হইল না। বাল্যের—কিশোরের—যৌবনের সকল কথাই যেন প্রত্যক্ষ স্বপ্নের স্মৃতির মত, তাহার মনে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

মীর লতিফ কম্পিত স্বরে বলিল—"সেটা কি ভাল? নবাব সুজা বেগ কি মনে করিবেন?"

জুমেলি। নবাব এখানে নাই। তিনি আজমীরে গিয়াছেন। বোধ হয় দুই দিন ফিরিবেন না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। মীর লতিফ মনে মনে অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল।

অনেক দিনের কথা! সেই আনারউন্নিসা, সেই বাল্য ক্রীড়া, সেই দিবারাত্রব্যাপী সাহচর্য্যও আসক্তি—সেই আসক্তিতে প্রেমের মধুর বিকাশ। তার পর দারুণ নিরাশাময় যবনিকার পতনে, মিলনের পরিবর্ত্তে চিরদিনের বিরহ। হায়! সেই রূপসম্পদময়ী, স্নেহময়ী, সহাস্যমুখী, আনারউন্নিসাকে যে কত দিন দেখি নাই! দুঃখের দিনে যাহার দুঃখ কষ্টে দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার সুখের দিনে—একটু আনন্দিত হইব না কেন? দেখায় একবার দোষ কি?

সন্দেহে দোলায়মান চিত্ত, স্থির ভাব ধারণ করিল। প্রবৃত্তি দমনের শক্তি, দর্শনাকাঙ্ক্ষার প্রবল টানে শিথিল হইয়া গেল।

মীর লতিফ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভাল তাহাই হউক। তোমার বেগমকে গিয়া সংবাদ দাও।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জুমেলির মুখে সংবাদ পাইয়াই, আনারউন্নিসা, এক কক্ষ মধ্যে মীর লতিফের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। কক্ষ সন্ধ্যা সমাগমে পূর্ণভাবে দীপোজ্জলিত। আর সেই মৃদুকম্পিত দীপ-শিখার মত তাহার হৃদয়ও দুরু দুরু কাঁপিতেছে।

মীর লতিফ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, আনার-উন্নিসা সহর্ষে বলিয়া উঠিল —"মীর লতিফ !"

মীর লতিফও স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিল—"আনারউন্নিসা !"

বহু দিনের পর দেখা ! দুই জনে চোখে চোখে মিলন। উভয়েরই হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে—ধীরে স্পন্দিত। উভয়েরই বেশী কথা বলিয়া মনোভাব প্রকাশের অবসর কম।

মীরলতিফ দেখিল—আনার উন্নিসা, ভাদ্রের ভরা দরিয়ার মত, কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। অঙ্গের ঢল ঢল লাবণ্য, রূপের সমুজ্জ্বল প্রভা, মুখের গম্ভীর ভাব, সলজ্জ চাহনি, যৌবনের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য সম্পদ, তাহা সেই দেহবল্লরীতে পূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একখানি চিকণের কাজ করা ফিরোজা--রঙ্গের ওড়নায় আনার উন্নিসার ক্ষীণ দেহযষ্টি আবরিত। সেই চিকণের কাজের উপর, দীপের আলো পড়িয়াছে। সে অপ্সর সৌন্দর্য্যের, অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া মীর লতিফ ভাবিল—যেন নীল মেঘে, বিদ্যুৎকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। চিরচঞ্চলা সৌদামিনী, যেন স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

আনার উন্নিসা বলিল—"তবু ভাল, যে আমাকে মনে পড়িয়াছে। কি অপরাধ করিয়াছি আমি লতিফ্! যে আমার উপর এতটা নিষ্ঠুর হইয়া সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিলে ?"

এ যে এক অদ্ভুত উল্টা অভিযোগ। কে যে নিষ্ঠুর,—কে যে কাহার সহিত সম্পর্ক লোপ করিল, তাহার উত্তর দিতে সক্ষম

কেবল উভয়েরই মন। কিন্তু সে মনের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিতে গেলে, শুষ্ক ক্ষতে আবার আঘাত পড়ে। কাজেই মীর লতিফ নিরুত্তরে রহিল।

আনার উন্নিসা, মীর লতিফের হাত খানি ধরিয়া একটী—সোফায় উপর বসাইল। বহুদিনের পর সেই বিদ্যুন্ময় স্পর্শে, মীর লতিফের শরীরের সর্ব্বত্রই যেন একটা মৃদু বৈদ্যুতিক উত্তেজনার স্রোত বহিয়া গেল।

আনার, মলিন মুখে লতিফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। লতিফ বলিল,—"বসনা তুমি ও খানে আনার।"

আনার উন্নিসা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না বেশ আছি! আগে বল দেখি, তুমি কেমন আছ লতিফ?"

মীর লতিফ মলিন হাস্যের সহিত বলিল,—"মন্দই বা কি? জীবনের দিন গুলি, বিদেশে প্রবাসে কাটিতেছে মন্দ নয়। কিন্তু তোমার মুখ অত মলিন কেন? তুমি কেমন আছ আনারউন্নিসা?"

আনারউন্নিসা একটী মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"খুব ভালই আছি আমি লতিফ্। অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক নবাব সুজাবেগের পত্নী আমি। দাসী বাঁদী আমার অনেক। গা-ভরা অলঙ্কার আমার—এতবড় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার স্বামিনী আমি! আমার মত সুখী কে মীর লতিফ্?"

আনারের উচ্ছ্বাসবদ্ধ কণ্ঠস্বর, ছল ছল নেত্র দেখিয়া, মীর লতিফ বুঝিল—এক সম্ভ্রান্ত ওমরাহের পত্নী হইয়াও, আনারউন্নিসা সুখী হইতে পারে নাই। সুখ ত ঐশ্বর্য্যের দাস নয়। সুখ—মনে।

তাহারই সুখের জন্য, সে যে খুব দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এতটা আত্মত্যাগের কি এই শোচনীয় পরিণাম ?

কি একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখ, অবক্তব্য মনের বেদনায়, আনার বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছে। সেটা যে কি, তা না জানিলে তার প্রতিকার করাও অসম্ভব।

এই জন্য আনারের হস্তধারণ করিয়া স্নেহ-পূর্ণ স্বরে মীর লতিফ্ বলিল,—"আনার উন্নিসা! তোমার এ মন কষ্টের কারণ কি ?"

এ অযাচিত সহানুভূতির প্রবল শক্তি, আনারের হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে গিয়া খুব জোরে আঘাত করিল। নবাব পত্নী হইবার পর তাহার ও মীর লতিফের মধ্যে যে একটা বিরাট ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সেই মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল।

অভাগিনী আনার উন্নিসা তখন ধীরে ধীরে বাহারবানু ঘটিত সমস্ত ব্যাপার, মীর লতিফকে বলিয়া ফেলিল। সে দিন যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহাও সে বলিতে ভুলিল না।

মীর লতিফ ধীরভাবে সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া বুঝিল,—"এই সর্ব্বনাশিনী বাহারবানু বর্ত্তমান থাকিতে, নবাব সুজাবেগ কখনই তাহার ছলনাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আর তাহা না হইলে, আনার উন্নিসাও এ জীবনে সুখী হইবে না। লতিফ্ চায় আনারের সুখ। সে চায়—আনারের সদা প্রফুল্ল হাস্যমুখ।

অসম্ভব আত্মত্যাগ করিয়া, আনারকে চিরসুখী দেখিবার জন্য লতিফ যে তাহার সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন সে

বুঝিল, তাহার সে উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। আনারউন্নিসাকে মনে মনে আরাধ্য দেবীরূপে আরাধনা করিয়া, তাহার রূপ চিন্তা করিয়াই যে তাহার সুখ। আনার উন্নিসাকে সুখী দেখিতে পাইলেই যে তাহার জীবনের সার্থকতা। কিন্তু নসীবে না থাকিলে সুখ দেয় কে? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে আনার উন্নিসা আজ এত অসুখী কেন? নবাব সুজাবেগের পত্নীর এ মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস কেন?

কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া মীর লতিফ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আনার উন্নিসা! মনে পড়ে এক দিন আমি আমার দেহের শোণিত দিয়া, তোমার বিপন্ন জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম! একদিন তোমাকে নদী তরঙ্গের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আজও তোমার স্বার্থের জন্য, তোমার হিতের জন্য—তোমার সুখের পথের কণ্টক এই বাহারবানুকে তোমার পথ হইতে সরাইবার জন্য—যাহা কিছু করা সম্ভব—তাহা আমি করিতে প্রস্তুত।"

মীর লতিফ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই থামিয়া গেল। আর আনার উন্নিসা বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে লতিফের সেই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিল। সে মনে মনে বড়ই ভয় পাইল। সে জানিত, এই মীর লতিফ চিরদিনই ঘোর নির্ব্বন্ধবান। তাহার কথায় ভাবে সে বুঝিল, এখনও সে তাহার উপর সমানভাবে স্নেহশীল। আর এটুকুও বুঝিল, এই মীর লতিফ তাহার জন্য সবই করিতে পারে।

তাহা হইলেও আনার উন্নিসা লতিফের কথার ভাবে, একটু ভয় পাইয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল,—"তুমি কি বাহারকে হত্যা করিবে না কি?"

বিকট হাস্যের সহিত মীর লতিফ বলিল,—"না—না সে ভয় তোমার নাই। তাহার মত কলুষিতা নারীর শোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। হত্যা ভিন্ন আরও অনেক উপায় আছে, যাহার সহায়তায় আমি বাহারের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। নবাব সু[illegible]বেগের উপর তাহার এতটা আধিপত্য কিসে, ইহার মধ্যে প্রেমের ব্যাপার ছাড়া আরও কোন কিছু আছে কি না, এ গূঢ় রহস্য যে দিন জানিতে পারিব সেই দিনই নবাব সুজা খাঁর ব্যাধির শান্তি হইবে। তুমিও কণ্টকমুক্ত হইবে।"

এই কথা বলিয়া, উত্তেজিত মুখে মীর লতিফ উঠিয়া দাঁড়াইল। আনার উন্নিসা তাহাকে আর একটু অপেক্ষা করিবার জন্য, বার বার অনুরোধ করিলেও, সে তাহা রক্ষা করিল না। যাইবার সময় কেবল-মাত্র বলিয়া গেল—"আর তিন দিন পরে, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব। সেই দিন বলিব, তোমার কাজ কত দূর অগ্রসর হইল।"

মীর লতিফ্ চলিয়া গেলে, আনার উন্নিসা সেই কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। সে এক এক বার মনে মনে ভাবিল—"নবাব সুজাখাঁ যে তাহাকে আজকাল এতটা অগ্রাহ্য করেন, বাহারবানুর প্রেমের মোহই এই তুচ্ছ তাচ্ছল্যের মূল। আর এ কথাটা মীর লতিফের কাছে বলিয়া, সে যেন খুবই একটা হাল্‌কা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। যদি দুঃখ ভোগই তাহার ভবিতব্য হয়, তাহা হইলে, বিধাতা রমণীকে যে সহিষ্ণুতা শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে এ দুঃখটা নীরবে মনে মনে সহিয়া গেলেই ত ভাল হইত! বিধাতা স্বহস্তে তাহার ললাটফলকে যে দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন,

তাহার শক্তি লোপ, এ ক্ষুদ্র মানব মীর লতিফ্ কি করিয়া করিবে? যে স্বামী তাহার সকল দুঃখ মোচনের কর্ত্তা—তাহার জ্বালাময় অশ্রুজল মুছাইবার অধিকারী, তিনি যখন তাহা পারিলেন না—তখন এই ক্ষুদ্র শক্তি মীর লতিফ কি করিবে?"

কিন্তু সে জানিত, মীর লতিফ বড়ই হিংস্র প্রকৃতি। রাগ হইলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তাহার মুখ দিয়া একবার যে প্রতিশ্রুতি বাক্য বাহির হয়, তাহা পালনের জন্য সে তাহার জীবনকে বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তবে কি মীর লতিফ তাহারা সুখের পথের কণ্টক উন্মূলিত করিবার জন্য, বাহারবানুকে হত্যা করিবে?

আনার এই সব চিন্তায় ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যায় গিয়া মুখ লুকাইল। কি একটা যাতনায় যে তাহার প্রাণ মুচড়াইয়া ধরিতেছে, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। চারিদিক হইতে যেন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক, ছায়াময় বিভীষিকা, তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সে এই সব ভাবিতে ভাবিতে, সে অবসন্ন চিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল।

জুমেলি আজকাল নীচে থাকিত। কেননা আনার—এদানীং বড়ই নির্জ্জনতা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন আবার ঘটনাবশে আকাশটা খুব মেঘাচ্ছন্ন। আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। সেই কক্ষ মধ্যে বিনিদ্র নেত্রে আনার একা। বাহিরে প্রকৃতির অন্ধকার, আর বায়ুর প্রবল সন্‌সনানি, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি দেখিয়া সে বড়ই ভয় পাইল। নবাব সুজাখাঁর জন্য সে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আবার বিদ্যুৎ ! আবার মেঘ গর্জ্জন ! আবার বজ্রনাদ ! আনার উন্নিসা ভয়ে চমকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কোথায় তুমি জীবিতেশ্বর ! কোথায় তুমি নবাব সুজা খাঁ ! এস আমার হৃদয়ের ধন ! আমার ঘরে ফিরিয়া এস। আমি বড়ই ভয় পাইতেছি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এমন সময়ে একজন দ্রুত পদে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আনারের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিল—"ভয় কি আনার উন্নিসা ? এই এই যে আমি আসিয়াছি।"

আনার তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াই, সবিস্ময়ে দেখিল নবাব তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিতেছেন—"ভয় কি আনার ?"

এত রাত্রে নবাবকে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আনারউন্নিসা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুমি ! প্রাণাধিক আমার ! আঃ ! আমার সকল ভয় গেল।"

আনার শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া আনন্দভরে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল। বলিল—"আসিয়াছ ভালই করিয়াছ। মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ বজ্রনাদ, আর তার সঙ্গে কত দুশ্চিন্তা, আমায় বড়ই ভয় দেখাইতেছিল। আমি যে খোদাকে ভুলিয়া তোমাকেই স্মরণ করিতেছিলাম।"

আনার উন্নিসা দেখিল, বৃষ্টির জলে নবাবের পরিধেয় বস্ত্র স্থানে স্থানে ভিজিয়া গিয়াছে। সে গুলি ত্বরিতে খুলিয়া লইয়া, সে তখনই শুষ্ক বস্ত্র আনিল। নবাব বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া

একটু সুস্থ হইলে, আনার বলিল,—"আমার খাবার চাপা আছে কিছু খাইবে কি? সরবৎ বা কফি তৈয়ারী করিব?"

নবাব সুজা খাঁ বলিলেন,—"না কিছুরই প্রয়োজন নাই। তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও। কাল প্রভাতে তোমাকে সকল কথা বলিব। আজ আমি বড়ই শ্রান্ত।"

আনার স্বামীর এ ব্যবস্থার উপর কোন কথা কহিতে পারিল না। তাহার দুশ্চিন্তাময়ী রজনী, সুখ নিদ্রায় কাটিয়া গেল।

দিনের ঘটনার পর বিচার করিয়া লোকে বলে, আজ আমার সু বা কু-প্রভাত। কথাটা খুব সত্য। কিন্তু আমরা বলিতে পারি পর দিন আনারউন্নিসা ও নবাব সুজাবেগ উভয়ের পক্ষেরই কু-প্রভাত। কেন তাহাদের প্রকাশ পাইবে।

সুজা খাঁ বেলা এক প্রহরের পর, নিজের কক্ষ মধ্যে বসিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে এক বান্দা আসিয়া, তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল।

পত্রের লেখা দেখিয়াই সুজাবেগ বুঝিলেন, পত্রখানি বাহার-বান্নুর নিকট হইতে আসিয়াছে। বান্দাকে নেত্র ইঙ্গিতে বিদায় করিয়া দিয়া, নবাব সুজাবেগ সেই পত্রখানি সমনোযোগে পাঠ করিলেন। পাঠান্তে তাঁহার মুখখানি খুবই মলিন হইয়া পড়িল।

সহসা দ্বার সন্নিকটে তিনি যেন কাহারও সাবধান বিন্যস্ত পাদ-বিক্ষেপ-শব্দ শুনিতে পাইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার পত্নী আনারউন্নিসা তাঁহার কক্ষের দিকে আসিতেছে। নবাব সাহেব, তাঁহার বিশ্রাম

কক্ষেই বসিয়াছিলেন। সুতরাং তখনই ব্যস্তভাবে সেই পত্রখানি লুকাইয়া ফেলিলেন।

আনার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া স্মিতমুখে বলিল,—"আজ কেমন আছ তুমি নবাব?"

নবাব সুজ খাঁ, মলিন হাস্যের সহিত আনারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি ভাল থাকিলে, তোমার হাসিমুখ দেখিলেই আমার যে অপার আনন্দ আনারউন্নিসা!"

আনার। হইতে পারে! কিন্তু তবুও বুঝিতেছি, আজ তোমার তবিয়ৎ বা মন কিছুই যেন ভাল নয়?

সুজা। কেমন করিয়া জানিলে?

আনার। কাল সারারাত তুমি ভাল করিয়া নিদ্রা যাও নাই। তোমার নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত, আমি দীর্ঘক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া তোমাকে ব্যজন করিয়াছি। আর এই পবিত্র স্নিগ্ধ প্রভাতে, তোমার হাস্য বিহীন বিরস মলিন মুখ আমার স্পষ্টই বুঝাইয়া দিতেছে; যেন কি একটা দারুণ দুশ্চিন্তা—"

সুজাবেগ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আনার! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

আনার। সে কি? কি বলিতেছ তুমি?

সুজাবেগ। আমার পাঁচলক্ষ টাকার জহরত এক মহাজনের গদীতে গচ্ছিত ছিল। তাহাই আনিতে আজমীরে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, যে দুই মাস পূর্ব্বে তাহা চোরে লইয়া গিয়াছে। যার কাছে জমা ছিল, সে লোকটা ভয়ে নিরাশায় আত্মহত্যা

করিয়াছে। জহরত গুলির কোন পাত্তাই নাই। গদী ও উঠিয়া গিয়াছে। আমার বর্ত্তমান বড়ই অন্ধকারময়।"

আনার। গেলই বা পাঁচলক্ষ টাকা। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে টাকার অভাব কি?

সুজাবেগ। যে কথা তোমায় সেদিন বলি নাই, তাহা আজ বলিব। আমি বড়ই বিপন্ন। শাহজাদা দারাকে আমি ছয় লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছি। দিতে না পারিলে আমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন!

আনার। ব্যাপার কি?

"সবই বলিতেছি। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে থাকিয়া এখন আর গোপন করিলে চলিবে না।" এই কথা গুলি বলিয়া নবাব সুজা-বেগ কক্ষের বাহিরে গিয়া একবার চারিদিকে দেখিয়া আসিলেন। দেখিলেন, কোন বান্দা বাঁদিই সেখানে নাই। তখন ধীরে ধীরে কক্ষের দরজাটী বন্ধ করিয়া দিয়া, সেই গুপ্ত কক্ষের মন্ত্রণা ব্যাপার সম্বন্ধে সকল কথাই আনারকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

নবাবের কথা শুনিয়া আনার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। সেই ভয় চকিত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া আনার মনে মনে ভাবিল,—"এ সংকট সময়ে সাহস হারাইলে চলিবে না। পত্নীর গভীর কর্ত্তব্য-পালনের যদি কোন উপযুক্ত অবসর আমার ঘটিয়া থাকে —তাহা এই।"

এইরূপ ভাবিয়া আনার অপেক্ষাকৃত প্রসন্নমুখে স্বামীকে বলিল, "তুমিই আমার রত্নালঙ্কার, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি বজায় থাকিলে আমার কিসের ভাবনা। সুখে দিন কাটিতেছিল, না হয়

একটু কষ্টে কাটিবে। কিন্তু সে কষ্টেও আমার জীবনে—সুখ। কেন না তুমি শাহজাদার নিকট প্রতিশ্রুতিমুক্ত হইবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি একটা কাজ সারিয়া আসিতেছি।"

এই কথা বলিয়া আনার দ্রুতপদে নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। রত্নালঙ্কারপূর্ণ ক্ষুদ্র পেটিকা একটী বাহির করিয়া,নিজের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার গুলি খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহা সাজাইয়া ফেলিল। আর নবাব সুজাখাঁর জন্মতিথির দিনে সে যে বহুমূল্য হার রুখিনা বিবির নিকট উপহার পাইয়াছিল, ও যে লক্ষটাকা মূল্যের হীরক হার, বিবাহের পর নবাব সুজাখাঁ তাহাকে প্রেমোপহাররূপে দিয়াছিলেন তাহাও লইয়া নবাব সুজা বেগের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নবাব সুজাবেগ কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতনেত্রে আনারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এ সব রত্নালঙ্কার লইয়া আমি কি করিব আনারউন্নিসা ?"

আনার উন্নিসা। এগুলি বিক্রয় করিয়া তুমি শাহাজাদার নিকট ঋণমুক্ত হও, প্রতিশ্রুতি মুক্ত হও। আমার অলঙ্কার পরা ত তোমার চিত্ত তুষ্টির জন্য। আর এ সব অলঙ্কার তোমারইঁ ত দেওয়া। সময় হয়, আবার করিয়া দিবে। নবাব! কখনও এ বাঁদী তোমার কাছে মুখ ফুটিয়া কোন কিছু প্রার্থনা করে নাই। আজ তোমার কাছে এই সামান্য প্রার্থনা করিতেছে। আমার এ ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ কর।" জনাব! মেহের বান ! এ বাঁদীর মুখের দিকে চাও।"

এই কথা বলিয়া আনার উন্নিসা, সুজাখাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। তাহার গণ্ডদেশে অশ্রুধারা। নবাব সুজাখাঁ সে করুণ দৃশ্য

সহ্য করিতে পারিলেন না। আনারকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আনার উন্নিসা! সত্যই তুমি দেবীরূপিণী! নারীর হৃদয়ের নীচ ভাবের মধ্যেই আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে। এই নারী জাতিকে বিধাতা যে কি মহত্ত্বময় উপদানে গড়িয়াছেন, তাহা আজ দেখিবার অবসর পাইলাম। আমি তোমার নরাধম স্বামী। তোমার মত এক বহুমূল্য রত্ন খোদা আমায় দিয়াছেন। সে রত্ন আমি স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়াছি। জীবনাধিকে! প্রিয়তমে! তোমার এ ঋণ কি কখনও শোধ করিতে পারিব? ছিঃ! চোখের জল ফেলিও না। তোমার প্রার্থনাই আমি পূর্ণ করিলাম। এই দুনিয়ায় শয়তানের ছলনায় পড়িয়া, অনেক রকমে নাম কিনিয়াছি। আর তার সঙ্গে এ কীর্ত্তিটাও থাকিয়া যাউক, যে চরিত্রভ্রষ্ট, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন নবাব সুজাখাঁ, দত্তাপহারী রূপে, তাহার পত্নীর স্ত্রীধন অপহরণ করিয়া নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে। নিজের জঘন্য জীবন বাঁচাইয়াছে।'

প্রকাশ্যে একথা বলিলেও, তাঁহার মনের ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন—"আমার বিষয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়াও যদি কোন উপায়ে এই ছয়লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে এ অলঙ্কারের এক খানিও আমি স্পর্শ করিব না।"

এইরূপ সংকল্প স্থির করিয়া নবাব সুজাখাঁ বলিলেন—"ভাল তাহাই হইবে। তুমি এখন তোমার সংসার ধর্ম্ম কর গে।"

আনার উন্নিসা প্রসন্ন মুখে, ভয় ভাবনা রহিত হৃদয়ে, স্বামীর কক্ষ ত্যাগ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ যখন দুঃসময়ের পীড়নে চারি দিক হইতে বিপদাক্রান্ত হয়, তখন সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। ব্যূহমধ্যস্থ যোদ্ধা, যেমন চারি দিক হইতে শত্রুর শরজালে আক্রান্ত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়েন, নবাব সুজাখাঁর অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

শাহজাদাকে যে কয়েক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে, তাহার একটা উপায় আপাততঃ হইল বটে, কিন্তু তার চেয়েও আরও একটা ভয়ানক চিন্তা, নবাবের হৃদয়কে ক্রমাগতঃ অঙ্কুশ বিদ্ধ করিতেছিল। সেটা বাহারবানুর সেই সাংঘাতিক পত্র।

নবাব সুজাখাঁ সেই পত্রখানি আবার পড়িলেন। পত্রে লেখা ছিল—"আমার নিয়োজিত চর আমায় সংবাদ দিয়াছে, যে তুমি গত রাত্রে বাটী ফিরিয়াছ। আজ সন্ধ্যার পর আরাম-বাগে আসিতেই চাও। আজ আমাদের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব পরিষ্কার হইবে। যদি না আস, তাহা হইলে, কাল প্রভাতেই তোমার গোপনীয় পত্রগুলি শাহজাদা দারার হাতে গিয়া পড়িবে। এই হিসাব নিকাশের মূল পণ, তোমার পত্নী আনার উন্নিসা বেগমের বহুমূল্য রত্নহার। তাহার বিনিময়ে আমি এই গোপনীয় পত্রগুলি তোমায় প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত।—"বাহারবানু।"

সুজাখাঁ এই পত্রখানি দুই তিনবার পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ভয়ানক একটা উত্তেজনা দেখা দিল। তিনি পত্রখানি

আবার লুকাইয়া রাখিয়া, মনে মনে এই আগন্তুক বিপদ হইতে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ চিন্তার পর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অতি সূক্ষ্ম আলোকরেখা দেখিয়া, দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "শয়তানি! পিশাচি! যদি একদিন তোর হৃদয়ের শোণিত আকর্ষণ করিতে পারি—তাহা হইলে বুঝিব, তোর এ ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছি।"

সন্ধ্যার পর আনারউন্নিসার সেই বহুমূল্য রত্নহারের ক্ষুদ্র পেটিকাটি বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, নবাব গৃহের বাহির হইতে যাইতেছেন—এমন সময়ে আনারউন্নিসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিল—"এত ব্যস্ত ভাবে কোথায় যাইতেছ তুমি প্রিয়তম!"

সুজাখাঁ আনারের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কোন একটা লোকের সহিত শাহজাদার আর্থিক ব্যাপার সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য, ঘণ্টা কয়েকের মত আমাকে আরামবাগে একবার যাইতে হইবে। মধ্য রাত্রের পূর্ব্বেই আমি ফিরিয়া আসিব। কোন চিন্তা নাই তোমার আনার।"

সুজাখাঁর সঙ্কল্পিত কাজে সহসা একটা বাধা স্বরূপ আসিয়া পড়ায়, আনার যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কম্পিত স্বরে বলিল—"খোদা তোমার কার্য্য সিদ্ধি করুন! বেশী রাত্রি করিও না। আমি তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।"

সুজাখাঁ পত্নীর নিকট বিদায় হইয়া, যানারোহণে আরাম-

বাগের পথ ধরিলেন। যতক্ষণ দেখা যায়, আনারউন্নিসা একদৃষ্টে বাতায়ন পথ দিয়া তাঁহার দ্রুতগামী যানের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল—"খোদা তোমাকে সহস্র বিপদ হইতে রক্ষা করুন! হায়! জানি না—আজ তোমাকে বিদায় দিয়া আমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? কি যেন একটা বিপদের ছায়া, চোখের সম্মুখে বিভীষিকা বিস্তার করিতেছে কেন?"

যথাসময়ে সুজাখাঁ আরামবাগে আসিয়া পৌছিলেন। নবাব যখন এখানে সর্ব্বদা বাস করিতেন—তখন অনেক বান্দা ও বাঁদী এ বাগানে থাকিত। এখন কেবল দুইজন পুরীরক্ষক আরামবাগের হেপাজতে আছে। তাহারা জানিত, যে নবাব সন্ধ্যার পর আরামবাগে আসিবেন, সুতরাং তাহারা সন্ধ্যার সময়েই তাঁহার বসিবার কক্ষটী দীপোজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল।

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইল। এই এক প্রহরব্যাপী কাল, নবাব চিন্তায় কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার তখনকার চিন্তা, আনারের এই বহুমূল্য রত্নহার না দিয়া কি উপায়ে সেই শয়তানীর নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত সাংঘাতিক পত্রগুলি কৌশলে সংগ্রহ করা যায়।

দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তায়, একটা অবসন্ন ভাব দেখা দিল। এ অবসন্ন ভাবটীকে বিদূরিত করিবার জন্য, নবাব সুজা বেগ এক পাত্র সেরাজি পান করিলেন।

কক্ষটী শব্দশূন্য। দীপশিখা গুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার চিন্তাব্যাকুল হৃদয়ের মধ্যেও যেন সেই মৃদু কম্পনের ঘাত প্রতিঘাত উঠিয়াছে। এটা নিরর্থক আশা প্রতীক্ষার পরিণাম। কোন একটা কূট সমস্যার সমাধানের উপায় হানতা জন্য—দারুণ অবসাদ!

সহসা এই সময়ে সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া এক রমণী-মূর্ত্তি ধীর পদে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধাবনতভাবে একটী কুর্ণীস করিয়া সহাস্যমুখে বলিল,—"বন্দেগি জনাব!"

সুজাবেগ মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—উজ্জ্বল বেশ পরিহিতা সুরমা-রঞ্জিত বিচিত্র কটাক্ষ-শালিনী, স্ফুরিতাধরা, বাহারবানু তাঁহার সম্মুখে। তিনি একটু অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন,—"এত দেরী করলে যে বাহারবানু?"

বাহারবানু সহাস্যমুখে বলিল,—"আরামবাগের গুপ্তদ্বারের চাবিটা খুঁজিতেই দেরী হইয়া গিয়াছে। নবাব সাহেবকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার জন্য, বাঁদী মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছে।"

সুজাবেগ বুঝিলেন—এটা বিদ্রূপ। এ বিদ্রূপের জ্বালা বড়ই তীব্র। জ্বালার তীব্রতা কমাইবার জন্য, তিনি আর এক পাত্র সেরাজি পান করিলেন। তার পর বাহারবানুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাহার! তুমি অতি পাষাণী! অতি অকৃতজ্ঞ। তোমার প্রাণ নাই,—হৃদয় নাই,—মমতা নাই,—করুণা নাই! তোমায় আমি না দিয়াছি কি বাহারবানু? কেন আমাকে এ ভাবে নির্য্যাতন করিতেছ?"

বাহারবানু এ কথায় রাগিয়া উঠিয়া বলিল,—"দোষ কি একা আমার নবাব! আমিই কি উপযাচিকা হইয়া দীনার মতন তোমার কাছে প্রেমভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। মনে পড়ে কি তোমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা,—যে তুমি আমাকে ভবিষ্যতে তোমার ধর্ম্মপত্নী করিবে? তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের একাধিশ্বরী হইয়া আমি আবার অভিজাত-সমাজে বরণীয় হইব? ভাগ্য পরীক্ষার্থে আমি এ হিন্দুস্থানে আসিয়াছি। আমার ভাগ্য তোমার রূপা ও করুণার চরণতলে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। অতি নিষ্ঠুরের মত আমার সে ভাগ্য তুমি পদদলিত করিয়াছ। তোমার পত্নী আনারউন্নিসা দুই দুইবার আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সিরিয়ান আরমানী আমরা। অতি উষ্ণরক্ত আমাদের শিরায় ধমনীতে। অপমানের প্রতিশোধ কি করিয়া লইতে হয়, তা আমরা জানি। তুমি নিজেই তো আমার সহিত সকল সম্পর্ক লোপ করিয়াছ। কে তুমি—আমার নবাব সুজা বেগ? যে তোমার জন্য আমি এতটা সহিব?"

বড়ই প্রখর জ্বালাময় শ্লেষ! সুজাবেগ এক ঘৃণিতা স্বৈরিণীর এ প্রগল্ভতা সহিতে পারিলেন না। তাঁহার এক এক সময়ে মনে হইতেছিল, যে একটী পদাঘাতে এই ধৃষ্টা স্বৈরিণীকে আরাম-বাগ হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তি দমন করিয়া তিনি আর এক পাত্র সেরাজি পান করিলেন। তৎপরে কঠোর স্বরে বলিলেন,—"আমার সেই পত্র গুলি আনিয়াছ?"

বাহারবানু বলিল—"নিশ্চয়ই!"

সুজা। কি পণে এ পত্রগুলি আমায় তুমি ফিরাইয়া দিতে পার ?

বাহার। তোমার পত্নীর লক্ষ টাকা মূল্যের কণ্ঠহার !

সুজা। যদি তাহা না দিই !

বাহার। তাহা হইলে তোমার লিখিত এই পত্রগুলি শাহজাদা দারা শেকোর নিকট আজই পৌঁছিবে। তুমি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ, যে এই পত্রগুলি তুমি শাহজাদা ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলে, কিন্তু নানা কারণে তাহা পাঠাইবার সুযোগ পাও নাই।

সুজা। আমি যে এ সব পত্র লিখিয়াছিলাম তাঁহার প্রমাণ ?

বাহার। প্রমাণ—তোমার নিজের হস্তাক্ষর। তোমার নামের মোহর। ভুলিয়া গিয়াছ কি তুমি নবাব! যে এই সব পত্র লেখার সাক্ষী আমি।

সুজা খাঁ দেখিলেন, যে কোন প্রকারে হউক এই সাংঘাতিক পত্রগুলি সংগ্রহ করা বই আর কোন উপায় নাই। এই শয়তানী তাঁহাকে চক্রান্তের বেড়াজালে ফেলিয়া—পিসিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। সামান্যা এক রমণীর বুদ্ধির নিকট এ শোচনীয় পরাজয়, যেন তাহার বুকে শেল বিঁধিতে লাগিল। তিনি আবার পাত্রটি পূর্ণ করিয়া মদিরা পান করিলেন। তৎপরে বলিলেন, "ভাল ! তোমার এ কঠোর পণেই আমি স্বীকৃত। এই লও রত্নহার ! কিন্তু পত্রগুলি আগে আমাকে দাও।"

নবাব সুজাবেগ রত্নহারের আধারটী খুলিয়া, বাহারবানুর সম্মুখে ধরিলেন। সমুজ্জ্বল দীপালোকে সেই স্বর্ণগ্রথিত বহুমূল্য

হারের হীরাগুলি দপ দপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অলঙ্কারলুব্ধা স্বৈরিণী ভাবিয়া দেখিল, এই বহুমূল্য রত্নহারের বিনিময়ে সে নবাবের পত্রগুলি ফিরাইয়া দিতে খুবই প্রস্তুত।

প্রফুল্লমুখে, সে তাহার বক্ষবসনের মধ্য হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিল। বলিল—"এক হাতে এ পত্রগুলি নাও, অপর হাতে আমাকে ঐ রত্নহারটী দাও।"

সুজাবেগ রত্নহারটী বাহারবানুর সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলি লইলেন। সে পত্রগুলি পড়িয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তিনি আবার এক পাত্র সেরাজি পান করিয়া, সেই সাংঘাতিক পত্রগুলি তাঁহার বক্ষবসনের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে শয়তান আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপিল। নবাব সুজাবেগ ভাবিলেন, এই কক্ষ নির্জ্জন। কেহই এখানে নাই। সামান্য এক রমণী আমাকে এই ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া পলাইবে? ছিঃ—কি ঘৃণা! কি—লজ্জা! আমার প্রিয়তমা পত্নীর পবিত্র কণ্ঠহার কিনা এই কলঙ্কিতা স্বৈরিণীর ভোগ্য হইবে?"

শয়তান তাঁহার কাণে কাণে বলিল "পত্রগুলি তোমার হস্তগত। ঐ শয়তানীকে এখনই তুমি হত্যা কর। উহার মৃতদেহ আরামবাগের তয়খানার মধ্যে পুতিয়া ফেল। অতি সহজেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।"

শয়তানের এই উপদেশ, তখন তাঁহার মনে খুবই বসিয়া গেল। বাহারবানু সেই রত্নহার লইয়া সহাস্য মুখে বলিল—"বন্দেগি

জনাব! আজ আমাদের মধ্যে দেনা পাওনার ফারখত হইয়া গেল। আর আপনার সম্মুখে আমি আসিব না।"

নবাব সুজাবেগ তখনই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া, বাহার বানুর গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া, সজোরে তাঁহাকে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন —"কোথায় যাইবি তুই শয়তানী! যে আরামবাগ এক দিন তোর সাধের বিলাস-কানন ছিল, আজ সেখানেই তোর সমাধি রচিত হইবে।"

বাহারবানু সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, নবাব সুজাবেগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। নবাবের মুখের অবস্থা দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। নবাব তাহাকে হত্যা করিতেই দৃঢ় সংকল্প।

সে ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার বক্ষ বসন হইতে এক তীক্ষ্ণমুখ ছোরা বাহির করিয়া, নবাব সুজাখাঁর স্কন্ধদেশে সজোরে আঘাত করিল। মদিরা-বিহ্বল সুজাখাঁ, সে আঘাতের প্রচণ্ড শক্তি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, মাটীতে পড়িয়া গেলেন। আর সেই শয়তানী বাহারবানু, সেই রত্নাধারটি লইয়া তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

গুপ্ত দ্বার খোলা ছিল। সেই দ্বারের অদূরে একখানি গাড়ীও দাঁড়াইয়া ছিল। শয়তানী সেই গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

একজন দূরে থাকিয়া তাহার এই পলায়ন ব্যাপার লক্ষ্য করিল। সে আর কেউ নয়—মীর লতিফ্। মীর লতিফ্ কি করিয়া এখানে আসিল, তাহা পরে বলিতেছি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য—সেই গভীর নিশীথে আনারের পিতা জুমলা খাঁ কোন এক অপরিচিতের মুখে সংবাদ পাইলেন—যে তাঁহার জামাতা, আহত অবস্থায় আরামবাগে পড়িয়া আছেন।

সংবাদ পাইবামাত্র, জুমলা খাঁ সর্ব্বপ্রথমে হাকিমের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। তৎপরে লোকজন সঙ্গে লইয়া, পালকী সহায়তায় নবাবের আহত শোণিতাক্ত দেহ তাঁহার প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। নবাব সুজাখাঁ সম্পূর্ণরূপে চেতনাহীন—স্পন্দহীন।

হতভাগিনী আনার, তত রাত্রি পর্য্যন্ত উপরের কক্ষে নবাবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়াছিল। এমন সময়ে জুমেলি দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল—"আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! নবাব সাহেব কোন গুপ্ত শত্রুর হস্তে আহত হইয়াছেন। তিনি চেতনা শূন্য। তাঁহার সর্ব্বশরীর শোণিত সিক্ত। শীঘ্র নামিয়া এস। তোমার পিতা তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছেন।"

বজ্রাহতা লতিকার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে, আনারউন্নিসা নীচে নামিয়া আসিয়া, যে শোচনীয় দৃশ্য দেখিল—তাহাতে সে ভয়ে আতঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বাঁদীরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া, পার্শ্বের কক্ষে লইয়া গেল। জুমেলি, মূর্চ্ছিতা আনারের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

জুমলা সাহেব—হাকিমকে নবাবের কুঠীতেই আসিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। বান্দাদের সহায়তায়, জুমলা আহত স্থানটী পরিস্কার করিয়া, সুজাখাঁকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় রাখিয়া-

ছিলেন। তখনও মৃদু ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। কিন্তু নেত্রদ্বয় নিমীলিত। প্রবল জ্বর আসিয়া দেহাধিকার করিয়াছে।

হকিম আসিয়া রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এই জ্বরটা ছাড়িবার সময় একটা বিভ্রাট ঘটিতে পারে। আঘাত যে খুব গুরুতর তা নয়। তবে বোধ হয়, ছুরিকা খানি বিষাক্ত! সুতরাং জীবন খুবই সঙ্কটাপন্ন।"

হকিম ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "প্রভাতে কোনরূপ খারাপ লক্ষণ দেখিলেই, আমায় সংবাদ দিবেন।"

আনার উন্নিসার তখন পূর্ণ চেতনা হইয়াছে। সে তখনই আসিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। জুমলা সাহেবের পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্বেও, সে শয্যাপার্শ্ব হইতে নড়িল না।

সমস্ত রাত্রিটা একই অবস্থা। সেই কান্তিময় দেহ নিস্পন্দে শয্যায় পড়িয়া আছে। হৃদয়ের স্পন্দন অতি মৃদু। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। আনার, একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সে ক্রমাগতই ভাবিতেছিল—কে এ সর্ব্বনাশ করিল? কে তাহাকে বলিয়া দিবে, কিসে নবাবের জীবন রক্ষা হয়।

স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে উর্দ্ধে চাহিয়া আনার যুক্তকরে বলিল—"বিধাতা! দয়াময়! পথের ভিখারিণী হইতেও আমি প্রস্তুত। আমার স্বর্ব্বস্বের বিনিময়ে আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দাও। যাহা একদিন তুমি করুণার দান রূপে স্বেচ্ছায় আমায় দিয়াছিলে, তাহা আজ নিষ্ঠুরের মত কাড়িয়া লইও না।"

এই সময়ে জুমলা সাহেব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ছিঃ—মা! একি কান্নার সময়? সাহসে বুক বাঁধ—সেবা কর। খোদার কৃপায় না হয় কি?"

আনার উন্নিসা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"কে আমার এ সর্ব্বনাশ করিল পিতা? আমিত কাহার কোন অনিষ্ট করি নাই।"

"যে করিয়াছে সে খোদার নিকট শাস্তি পাইবে। খোদাকে ডাক। এ বিপদে তিনিই আমাদের সহায় ও সান্ত্বনা।" এই কথা বলিয়া জুমলা সাহেব কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই গভীর নিশুতি রাত্রে, এই ভয়াবহ কাণ্ডের পর, শয়তানী বাহারবানু বাটীতে ফিরিল। পথিমধ্যে শকটওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া, সে তাহার আবাস বাটীর পশ্চাতের এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া—প্রেতিনীর ন্যায় নিঃশব্দে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল।

বাঁদী দুইজন রাত্রে বাটী চলিয়া যায়। কেবল মাত্র দ্বার রক্ষক একজন বান্দা, তাহার রক্ষকরূপে পুরীতে থাকে।

বাহারের কক্ষটী দীপোজ্জলিত। সে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, দ্বার ভেজাইয়া দিল। সেই রক্তাপ্লুত ভীষণ ছুরিকা খানি, তখনও তাহার হাতে। সে তাহার বস্ত্রমধ্য হইতে হীরক হারের পেটিকাটী বাহির করিয়া, দীপালোকের সম্মুখে রাখিল।

সেই বাক্সটী খুলিবামাত্রই, সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে দেখিল, যে সেই সমুজ্জল হীরক গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোণিত বিন্দু!

আর সেই সুশাণিত ইস্পাহানী ছুরিকাখানি, তখনও রক্তমাখা। সে রক্তের দাগ মুছিবার যেন কোন উপায় নাই।

চিত্তের এই বিপ্লবময় অবস্থার প্রতিকারের জন্য, সে প্রচুর পরিমাণে সেরাজী পান করিল। খুব একটা ভীষণ যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া, সে অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলিয়া উঠিল—"হায়! করিলাম কি?"

তার পর—দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া—সেই শোণিতাক্ত ছুরিকাখানি হাতে লইয়া বলিল—"বেশ করিয়াছি! ভালই করিয়াছি! ইরাণীর উষ্ণ রক্ত, অপমানের তাপে ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে এমন একটা কেন—দশটা নরহত্যা করিতেও আমি কুণ্ঠিতা হই না। এত অপমান! এত লাঞ্ছনা! এত প্রতারণা! এতটা নেমকহারামী!"

সহসা সে দেয়ালের গায়ে যেন কাহারও ছায়া মুর্ত্তি দেখিল। সে মুর্ত্তি দেখিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মদিরার উত্তেজনা, আর নরহত্যার একটা ভীষণ স্মৃতি, তাহার মস্তিষ্কটাকে খুবই গরম করিয়া তুলিয়াছে। সে সভয়ে সবিস্ময়ে, চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে—কে তুমি? নবাব সুজা খাঁ? তোমার হস্তে শাণিত ছুরিকা কেন? তুমি কি আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ?"

দেওয়ালের নিকটস্থ সেই ছায়ামূর্ত্তি, যেন তাহার সম্মুখে

সরিয়া আসিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "না—আমি নবাব সুজা খাঁ নই। আমি তোর যম!"

সেই মূর্ত্তির আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত। জড়িতস্বরে, কম্পিত হৃদয়ে বাহারবানু বলিল,—"সত্যই তুমি কি আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছ?"

আগন্তুক। হাঁ—

বাহার। আমি তোমার কি করিয়াছি?

আগন্তুক। তাহা বলিতে আমি বাধ্য নই। শয়তানী! মৃত্যু—তোর সম্মুখে! নবাব সুজাখাঁর হত্যাকারীকে শাস্তি দিবার জন্য খোদা আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

বাহার। কে বলিল—যে আমি নবাব সুজাখাঁকে হত্যা করিয়াছি? মিথ্যা কথা তোমার! তুমি দস্যু! এই বহু মূল্য রত্নহারের লোভে তুমি আমার অনুসরণ করিয়াছ।

আগন্তুক তখনই বাহারের সম্মুখে রক্ষিত, শোণিতাক্ত ছুরিকা খানি তুলিয়া বলিল—"শয়তানী! মৃত্যু তোর সম্মুখে! তবুও মিথ্যা কথা বলিতেছিস্ তুই! এই ছুরিকার গাত্রলিপ্ত শোণিত কলঙ্ক, যে নবাব সুজা খাঁর হৃদয়ের শোণিত! অই সমুজ্জ্বল হীরক-হারের উপর অতি ক্ষুদ্র লোহিত শোণিত বিন্দু, যে নবাব সুজাখাঁর হৃদয়ের শোণিত! তোকে আর বেশী বাঁচিয়া থাকিতে দিলে খোদার রাজত্বে একটী ভীষণ বিপ্লব ঘটিবে। তোর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একবার সেই করুণাময় খোদাকে স্মরণ কর।"

বাহারবানু বুঝিল,—ব্যাপার বড় সহজ নয়। সে তখনই

নতজানু হইয়া, আগন্তুকের চরণতলে বসিয়া পড়িয়া, যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণনেত্রে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "বড় অভাগিনী আমি। আমায় হত্যা করিও না। আমার জীবন ভিক্ষা দাও! এই বহুমূল্য হীরকহার, আর আমার যাহা কিছু অর্থ অলঙ্কার আছে—সবই তোমার। এ ভরা যৌবনে আমার অনেক সাধ! তাহার একটীও পূর্ণ হয় নাই। আমায় ছাড়িয়া দাও। আজ রাত্রেই আমি এই অভিশপ্ত আগরা হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

আগন্তুক বলিল,—"না—না, কোন মার্জ্জনাই তোর জন্য নাই। তোর মত এক পাপিষ্ঠার জন্য, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহি না। আনার উন্নিসার সর্ব্বনাশ যে করিয়াছে, তাহার সর্ব্বনাশ আমি করিব।"

বাহারবানু তখন বুঝিল, এ হত্যাকারী দস্যু নয়,—তস্কর নয়,—অর্থ লোভে তাহার গৃহে প্রবেশ করে নাই। সে আসিয়াছে, আনারউন্নিসার পথের কণ্টক মুক্ত করিতে। আনার উন্নিসা নিজে যে প্রতিশোধ লইতে অসমর্থ, তাহা করিবার ভার দিয়াছে, এই নিষ্ঠুর প্রাণহীন আগন্তুকের উপর।

বাহার তখন বিস্মিত চিত্তে বলিল,—"তাহা হইলে মরিবার পূর্ব্বে আমায় জানিতে দাও—কে তুমি?"

আগন্তুক সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"আমি মীর লতিফ! আনারের পিতার অন্নে পুষ্ট ক্রীতদাস আমি!"

বাহার বিদ্রূপ পূর্ণ স্বরে বলিল,—"ওঃ! তুমি মীর লতিফ! আনারউন্নিসার জার! লতিফ! কেন তুমি আমায় হত্যা করিবে?

আমি নবাব সুজাখাঁকে হত্যা করিয়া ত তোমার প্রেমের পথের কণ্টক মুক্ত করিয়া দিয়াছি ; আমার এই কর্ম্মের ফলে এখনত সেই দর্পিত আনার উন্নিসা তোমার।”

“আনারের জার” এ অপবাদ মীর লতিফ সহ্য করিতে পারিল না। সে তখনই উন্মাদের মত বিকট দৃষ্টিতে বাহারের সম্মুখস্থ সেই বিষাক্ত ছুরিকাখানি তুলিয়া লইয়া, তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিল !

আঘাত অতি সাংঘাতিক। সেই আঘাতেই বাহারবানু মরিল। তাহার মুখের শেষ কথা-“খো—দা—পা—পে—র প্রা—য়--শ্চি—ত্ত। চ—র--ণে - স্থা—ন—”.

এ ভীষণ মৃত্যু দেখিয়া, মীর লতিফ একটুও কাঁপিল না। টলিল না। সেই মৃতদেহ টানিয়া লইয়া. পার্শ্বের এক ক্ষুদ্র কক্ষে ফেলিয়া দিয়া তাহার দ্বারে চাবি দিল। তার পর বাহারের সেই হৃদয়শোণিতে কলঙ্কিত ছুরিকা ও হীরকহার লইয়া, পুরীর বাহিরে চলিয়া গেল।

চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের পূর্ব্বে নবাব সুজা বেগের চৈতন্য হইল। দেহের তাপ যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া আসিতেছে।

নবাব ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—“আমি কোথায় ?”

আনারউন্নিসা তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—“তুমি নিজের কুঠিতে আছ।”

সুজাখাঁ। আনার উন্নিসাকে একবার ডাকিয়া দাও।

আনার। আমিই ত তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি। কি কষ্ট হইতেছে নবাব?

সুজাখাঁ। আনার! আমি বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইব না।

আনার। ছিঃ! ও কথা বলিও না। তুমি এখন অনেক ভাল আছ। চেতনা ছিল না—চেতনা হইয়াছে। জরও কমিয়া আসিতেছে।

সুজাখাঁ একটু মলিন হাস্য করিয়া, আনারের মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ—বড় যাতনা। আনারউন্নিসা! আমি চলিলাম। বিদায় দাও—আমায় আনারউন্নিসা। তোমাকে লইয়া সোনার সংসার পাতিয়াছিলাম। শয়তানী বাহারবানু তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দিল।”

সুজা এই টুকু বলিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আনার তখনই তাঁহাকে উত্তেজক পানীয় দিল। তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। ক্লান্তিবশে চোখ বুজিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিবার পর, নবাব সুজাখাঁ চক্ষু চাহিয়া দেয়ালের দিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“ঐ—ঐ—সে আসিতেছে!”

আনার শশব্যস্তে, চকিতনেত্রে, সেই কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"কৈ—কেউ তো এখানে নাই প্রিয়তম!"

সুজা খাঁ আবার ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "ঐ—ঐ—বাহারবানু! সে প্রথম চেষ্টায় আমায় হত্যা করিতে পারে নাই বলিয়া, আবার ছুরি লইয়া মারিতে আসিতেছে! ঐ—সে! ঐ আবার আমার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল! আনার! আনার! রক্ষা কর। বাঁচাও—আমাকে! প্রতিশোধ লওয়া হলোনা!"

এই উত্তেজনার বিরামে নবাবের আর বাক্য স্ফুর্তি হইল না। সমস্ত দেহ সহসা হিমাঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাব সুজা খাঁ, শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়া, জন্মের মত নীরব হইলেন। সব ফুরাইল! সেই স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ুতে—তাঁহার জ্বালাময় শেষ নিঃশ্বাস মিশিল!

ঠিক এই সময়ে, কে একজন সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিল—"নবাব! তোমার শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিয়াছি। আনার! আনার! এই নাও সেই শোণিতাক্ত ছুরিকা! এই ছুরিকায় যে উজ্জ্বল শোণিত কলঙ্ক দেখিতেছ, তাহা নবাবের আর সেই শয়তানী বাহারবানুর! এই নাও তোমার রত্নহার! তোমার পথের কণ্টক সরাইবার জন্য তোমারই কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলাম। কাল সন্ধ্যার সময়, যখন তোমার কাছে আসি—তখন তুমিই কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলে, নবাব একাকী আরামবাগে গিয়াছেন। যে উপায়ে পার, নবাবকে বাঁচাও। কিন্তু নবাবকে ত বাঁচাইতে পারিলাম না! হায়! আনার! এক মুহূর্ত্ত আগে যদি

পৌঁছিতাম। তাই নিরাশায় মনস্তাপে, বাহারবানুকে হত্যা করিয়া, নবাব সুজাখাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়াছি !"

মীরলতিফ আনারের দিকে উন্মাদের মত বিকট দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সেই ছুরিকাখানি কক্ষ মধ্যে সজোরে নিক্ষেপ করিল। আর সেই রত্নহার আনারের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে বাহির লইয়া গেল। নবাবের মৃত্যুর সহিত সকল ঘটনার শেষ যবনিকা পড়িল।

* * * *

পারিবারিক মসৌলিশামে বা সমাধিক্ষেত্রে—নবাব সুজা বেগের বিনা আড়ম্বরে সমাধি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দুই মাস কাটিয়াছে। শোকের দিনই হৌক, আর সুখের দিনই হৌক, সমান ভাবেই সেগুলি চলিয়া যায়।

সুলতান দারা, নবাব সুজা বেগের মৃত্যু সংবাদে বড়ই ব্যথিত চিত্ত হইলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তিনি একজন অনুরাগী সুহৃৎ হারাইলেন। বাহারবানুর দ্বারাই যে এ হত্যা কাণ্ড ঘটিয়াছিল—সহরে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুলতান বাহারবানুকে ধরিবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে তাহার নিজের গৃহ হইতেই তাহার গলিত মৃতদেহ বাহির হইল। সকলে বুঝিল, বাহার রাজদণ্ডের ভয়ে, লাঞ্ছনার ভয়ে, আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই এক মাসে আনারউন্নিসারও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুখ, বিলাস, স্বচ্ছন্দ সবই সে ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার মুখের সে কান্তিলাবণ্য নাই—দেহে যত্ন নাই—বেশে আনুরক্তি নাই—

সংসারে স্পৃহা নাই। একখানি নীলবসনে তাহার দেহ আবরিত। সর্ব্বদেহ অলঙ্কার শূন্য। মার্জ্জনার অভাবে, চুলে জট পড়িয়া যাইতেছে। আহারে স্পৃহা নাই—লোকের সহিত মিশিতে বাসনা নাই। দিনরাত মর্ম্মভেদী আকুল নিশ্বাস, তীব্রশোক জনিত অস্ফুট ক্রন্দন—গণ্ডবাহী মলিন অশ্রুধারা।

প্রতিদিন গভীর রাত্রে, আনার অসংখ্য সুগন্ধি দীপ ও সুগন্ধ পুষ্প লইয়া, স্বামীর মসোলিয়ামের মধ্যে যায়। সুস্নিগ্ধ গোলাপ বারিতে, সেই সমাধিতল মার্জ্জনা করে। সেই মর্ম্মর কক্ষের মধ্যে অগুরু ও লোবানের দীপ জালিয়া দেয়। তারপর প্রেমস্মৃতি সুগন্ধিত অশ্রুধারায়, সেই সমাধিতল সিক্ত করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

জুমলা সাহেব, এখন বিষয় কার্য্য দেখিতেছেন। আনারের অভিলাষ অনুসারে, তাহার রত্নালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া, ধর্ম্ম-শালায় দরিদ্র পালনের জন্য দেওয়া হইয়াছে। মীরলতিফের ও এই দুই মাস কোন সংবাদ নাই।

জুমলা সাহেব কন্যাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মিষ্ট কথায় নিত্যই বুঝান। তিনি একদিন বলিলেন,—"আনার উন্নিসা! দেখিতেছি স্মৃতি তোমায় বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে। চল তোমাকে লইয়া আমি দিন কতক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি!"

আনারউন্নিসা কাঁদিতে বলিল—"ঐ যে পবিত্র মসোলিয়াম, যাহাতে আমার স্বামীর দেহ চির বিশ্রাম লাভ করিতেছে, তাহাই যে আমার মহাতীর্থ! জীবনে তাঁর পরিচর্য্যা করিতে

পারি নাই, কিন্তু তাঁর মরণে সে অবসর ঘটিয়াছে। এ সুযোগ ছাড়িব কেন? পিতা আমি—দেওয়ানা! সংসারের সহিত কোন সম্পর্কই আমার নাই। পিতা আমি—"দেওয়ানা।"

ইহার পর জুমলা সাহেব তাঁহার কন্যাকে আর কোনরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। মরুতাপবিদগ্ধ মলিন বন-কুসুমের মত, দিনে দিনে শুখাইয়া, আনার উন্নিসা, এক দিন নিরাশাময় ভগ্নহৃদয়ে, স্বামীর পার্শ্বে চিরনিদ্রিতা হইল।

এক দিন খুব মেঘ বৃষ্টি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার! মধ্যে মধ্যে দামিনী স্ফুরণ, সে অন্ধকারকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে।

এই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে, এক ছিন্ন মলিনবাস পরিহিত যুবা পুরুষ, বৃষ্টি ধারাসিক্ত দেহে, আনার ও নবাব সুজাবেগের সমাধিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার হাতে এক রাশ ফুল। বিকট দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সেই সমাধি দুটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সেই উন্মাদ, সেই শীতল সমাধির উপর সেই ফুলগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"মৃত্যুই—শান্তি! মৃত্যুর পর—অবিচ্ছিন্ন প্রেম! আঃ! কি সুখ তোমাদের! জ্বালাময় জীব আমি, চিরদিন জ্বলিতেই আসিয়াছিলাম।"

সে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিকট হাস্যের সহিত আবার অন্ধকারে মিশাইল। সে—মীরলতিফ।

সমাপ্ত।